POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 22

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 মে, 2025 1 যুল হজ্জ 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলের বাণী

কার্পণ্য করা থেকে বিরত থাকার এবং সদকা ও খয়রাত করার উপদেশ।

১৪২৭) হযরত হাকীম বিন হাজজাম (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- 'উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আর সর্বপ্রথম তাদেরকে দাও, যাদের তুমি লালন পালন কর আর উত্তম সদকা সেটিই যা চাহিদা পুরণের পর করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাচনা করা থেকে রক্ষা পেতে চাইবে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন আর যে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে চাইবে আল্লাহ্ তা তাকে অমুখাপেক্ষি করবেন।

১৪৩১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকাত নামায পড়ালেন। তিনি (সা.) এর পূর্বে কিম্বা পরে কোন নামায পড়েন নি। অতঃপর মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আর তাঁর সঙ্গে হযরত বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে উপদেশ দান করেন, তাদেরকে সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলে মহিলারা কেউ হাতের বালা, কেউ কানের গয়না নিক্ষেপ করছিল।

১৪৩৩) হযরত আসমা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) আমাকে বলেছেন- বেঁধে রেখো না। (খুলে দাও) অন্যথায় তোমাদের কাছে আসা থেকে আটকে দেওয়া হবে।

* উসমান বিন আবি শিবা আবাদাহর পক্ষ থেকে এই হাদীসটিই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আর এই কথাগুলি বলেছেন- 'গণনা করতে থেকো না, অন্যথায় আল্লাহও তোমাদেরকে গুনে গুনে দিবেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত)

****

যদি মতভেদ থাকে, ঐক্য না থাকে তবে হতভাগা হবে। প্রথমত, খোদার একত্ববাদ অবলম্বন কর। দ্বিতীয়ত, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

এর পূর্বেও আমি বহুবার জামাতের পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসার বিষয়ে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছি যে তোমরা পরস্পরের মধ্যে একতা ও সংহতি বজায় রাখ। খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে এক ও অভিন্ন সত্তা হয়ে থাকার উপদেশ দিয়েছেন, অন্যথায় তোমরা নিজেদের মর্যাদা হারাবে। নামাযে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ এজনই দেওয়া হয়েছে যাতে পারস্পরিক ঐক্য বজায় থাকে। একজনের পুণ্য অন্যের মাঝে বিদ্যুৎ তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চারিত হবে। যদি মতভেদ থাকে, ঐক্য না থাকে তবে হতভাগা হবে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী কর এবং একে অপরের জন গোপনে দোয়া কর। এক ব্যক্তি যদি গোপনের কারো জন্য দোয়া করে, তবে ফিরিশতা বলে, তোমার জন্যও এমনটা হোক। কি অপূর্ব শিক্ষা। যদি মানুষের দোয়া গৃহীত না হয় তবে ফিরিশতাদের দোয়া তো অবশ্যই গৃহীত হয়। আমি উপদেশ করছি এবং বলতে চাই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে যেন মতবিরোধ না দেখা দেয়।

আমি মূলত দুটি শিক্ষা নিয়ে এসেছি। প্রথমত, খোদার একত্ববাদ অবলম্বন কর। দ্বিতীয়ত, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। সেই নমুনা প্রদর্শন কর যা অন্যদের কাছে অলৌকিক প্রতিভাত হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মানীয় সাহাবাগণের মাঝে এই গুণটিই বিকশিত হয়েছিল। كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ (আলে ইমরান: ১০৪) স্মরণ রেখো! একতা হল এক অলৌকিক নিদর্শন। স্মরণ রেখো! যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা এমন না হয় যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা আপন ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। সে ঘোর বিপদের মধ্যে আছে,যার পরিণাম শুভ নয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৭)

বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কুরআন করীমের উপর আপত্তি করা আশ্চর্যের। অবশ্যই আমরা ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বাইবেলের কতিপয় বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, কিন্তু তা তখনই, যখন যৌক্তিক দিক থেকে এবং অন্যান্য ইতিহাস কিম্বা কুরআন করীমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউসুফের ৮১ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

যে ভাইয়ের সম্পর্কে 'কাবিরুহুম'বলা হয়েছে, এমনটি প্রতীত হয় যে তার অন্তরে, কিছুটা হলেও, খোদা ভীতি ছিল। কেননা প্রথমত সে তার ভাইদেরকে নিজের পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করে, দ্বিতীয়ত সে তার নিজের অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে। সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা অনুমতি না দেয় বা খোদা তালা স্বয়ং কোন মীমাংসা না করে দেন, আমি এখান থেকে যাব না। খোদা তা'লার মীমাংসার অর্থ হতে পারে, তার মনের মধ্যে একথা ঘুরপাক খাচ্ছিল যে যদি কোন প্রকারে বিন ইয়ামিন ছাড়া পেয়ে যায় আর আমি তাকে সঙ্গে করে ফিরে যাই।

হযরত ইউসুফের সব থেকে বড় ভাইয়ের নাম ছিল রোবিন আর বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ভাই সেই সময় বাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল সে ছিল ইহুদা, যে কিনা চতুর্থ নম্বর ভাই ছিল। খৃষ্টান লেখকরা এখানে আপত্তি করে যে, কুরআনের লেখকরা ইতিহাসও জানে না। কুরআন ইহুদার কথাকে রোবিনের কথা বলে দাবি করছে। খৃষ্টান গ্রন্থকারদের এমন আপত্তি দেখে আমি আশ্চর্যই হই। তারা এমনভাবে বাইবেলের উল্লেখ করে যেন সেটি সব থেকে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। অথচ খৃষ্টান লেখকদের বইপুস্তক এমন দলিল প্রমাণে পরিপূর্ণ যা ঐতিহাসিকভাবে বাইবেলের মর্যাদাকে অনেকাংশে খাটো করে দেয়। প্রাচীন ইতিহাসের কথা না-ই বলা গেল, মূসার গ্রন্থে মূসার যে সফর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলির সত্যতার বিষয়ে খৃষ্টান গবেষকরা নিজেরাই বিশ্বাসী নয়, আর সেগুলি ভৌগলিক অবস্থা এবং সে যুগের অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ ও বাইবেলের অভ্যন্তরীন সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতাকেই প্রকাশ করে। এমন পুস্তকের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কুরআন করীমের উপর আপত্তি করা আশ্চর্যের। অবশ্যই আমরা ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বাইবেলের কতিপয় বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, কিন্তু তা তখনই, যখন যৌক্তিক দিক থেকে এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ কিম্বা কুরআন করীমের সঙ্গে সেগুলি সমন্বয়পূর্ণ হয়। অন্যথায় বাইবেলের মধ্যে এত বেশি মানবীয় হস্তক্ষেপ ঘটেছে যে এর ইতিহাস পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে বলে দাবি করা

(এরপর শেষের পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

“ বহু মোজেযা এমন আছে যা নবীজী (সা.) শুধুমাত্র নিজস্ব শক্তির মাধ্যমেই দেখিয়েছিলেন, যেখানে কোনো দোয়া ছিল না। অনেক সময় অল্প পানি যা একটি মাত্র বাটিতে ছিল, তাতে তিনি নিজের আঙুল প্রবেশ করালে তা এত বেশি হয়ে যেত যে, একটি সম্পূর্ণ সৈন্যদল, উট এবং ঘোড়াগুলোও তা থেকে পানি পান করত, তবুও পানির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। অনেকবার কয়েকটি রুটির ওপর হাত রাখলে তা হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষকে তৃপ্ত করত। আবার কখনো অল্প দুধে নিজের ঠোঁটের বরকত দান করে একটি দলের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতেন। কখনো লবনাক্ত কূপে নিজের মুখের লালা ফেলে তা মিষ্টি করে দিতেন। আবার কখনো কোনো মারাত্মক আহত ব্যক্তির গায়ে হাত রেখে তাকে সুস্থ করে তুলতেন। এমনকি কারো চোখের পুতলি যুদ্ধের আঘাতে ছিটকে পড়লে নিজের হাতের বরকতে তা আবার ঠিক করে দিয়েছেন। এভাবেই অনেক অলৌকিক কাজ তিনি নিজ শক্তি ও ঐশী সাহায্যে সম্পন্ন করেছেন, যেগুলোর পেছনে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি মিশ্রিত ছিল।”

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

খায়বার ও যাতির রিকা’ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং আঁ হযরত (সা.)–এর পবিত্র জীবনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১১** এপ্রিল, **২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১১ শাহাদত ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,খায়বারের যুদ্ধের পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি হলো তায়মাবাসীদের শান্তি চুক্তির ঘটনা। তায়মা ছিল মদীনা থেকে সিরিয়ার পথে একটি প্রসিদ্ধ শহর যা মদীনা থেকে প্রায় চারশ’ কি.মি. দূরে অবস্থিত। (শারাহ যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩)

তায়মার ইহুদীরা খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদিউল কুরা’র (পরাজয়ের) সংবাদ অবগত হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, যা মহানবী (সা.) গ্রহণ করেন এবং তায়মার ইহুদীদেরকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তিসহ নিজ এলাকায় বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন।

(আল বাদায়া ওয়ান নাহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫২) (গাযওয়াত ও সারায়া, পৃ: ৩৮৮)

এ সময় ফজরের নামায দেরিতে পড়ার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সারা রাত সফর অব্যাহত রাখেন, যখন তাঁর ঘুম পায় তখন মদীনার নিকটবর্তী (স্থানে) বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন করেন এবং বেলাল (রা.)-কে বলেন, আজকের রাতে (তুমি) আমাদের নামাযের সময়ের সুরক্ষা করো (অর্থাৎ, খেয়াল রাখবে এবং নামাযের সময় জাগিয়ে দেবে।) এরপর হযরত বেলাল (রা.) তার জন্য যতটা সম্ভব ছিল নামায পড়েন (অর্থাৎ, জেগে থাকার জন্য সারা রাত নফল পড়তে থাকেন) এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা ঘুমিয়ে পড়েন। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে বেলাল (রা.) সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে নিজের বাহনের সাথে হেলান দিয়ে বসেন, উটনীর সাথে হেলান দিয়ে বেলাল (রা.)ও ঘুমিয়ে পড়েন। যার ফলে সূর্যের আলো বা রোদ তাদের গায়ে না পড়ার আগ পর্যন্ত মহানবী (সা.)ও সজাগ হন নি, বেলাল (রা.)ও নয় আর অন্য কোনো সাহাবীও জাগ্রত হন নি। মহানবী (সা.) সর্বাগ্রে সজাগ হন। তিনি (সা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বলেন, হে বেলাল! বেলাল (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমার রূহকে সেই সত্তা (জাগ্রত হওয়া থেকে) আটকে রেখেছেন যিনি আপনাকে আটকে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রার নির্দে শ প্রদান করেন। এরপর তারা নিজেদের বাহনকে কিছুদূর সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। এরপর মহানবী (সা.) কিছুদূর গিয়ে অবস্থান করেন এবং সেখানে ওযূ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দে শে বেলাল (রা.) নামাযের একামত দেন। অতঃপর তিনি (সা.) তাদের ফজরের নামায পড়ান। তিনি যেখানে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে পড়ান নি, বরং সামনে অগ্রসর হয়ে কোনোস্থানে গিয়ে বাজামা’ত নামায পড়ান। নামায শেষে তিনি (সা.) বলেন, ‘যদি কোনো ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে তার উচিত যখনই স্মরণ হবে সে যেন তা পড়ে নেয়, কেননা আল্লাহ্ তা’লা বলেন, আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা করো।’

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মোয়াজিউস সালাত, পৃ: ৬৮০)(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:১৪৯)

এটিও এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন, ফজর নামায দেরিতে (পড়ার) ঘটনা বিভিন্ন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে এটিকে তাবূকের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আবার অনেকে হুদায়বিয়ার সময়কার ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(তারিখুল খামিস, ২য় ভাগ, পৃ: ৪৩৭) (লাউলুল মাকনুন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৭)

হতে পারে বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন এবং অন্য কোনো যুদ্ধের ঘটনা এর সাথে উল্লেখ করেছেন অথবা সম্ভবত একাধিকবার এ ঘটনা ঘটে থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

মদীনায় ফেরত আসার সময় সাহাবীরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, মদীনায় ফিরে আসার সময় লোকেরা একটি উপত্যকায় আরোহণ করেন এবং তাকবীর ধ্বনিতে নিজেদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করেন। ‘اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ’ বলেন। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, ‘তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখো! তোমরা কোনো বধিরকে ডাকছো না, আর না কোনো অনুপস্থিত (সত্তাকে)। আল্লাহ্ তা’লা শ্রবণকারী এবং উপস্থিতও আছেন, তাই কণ্ঠস্বর মধ্যম রাখো। তোমরা তাঁকেই ডাকছ, যিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং খুবই নিকটবর্তী, আর তিনি তোমাদের সাথেই

আছেন।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর বাহনের পেছনে ছিলাম। তিনি আমার কথা শুনতে পান, যখন আমি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পড়ছিলাম। (মহানবীর একথা শুনে আমি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করি)। মহানবী (সা.) তখন আমার আওয়াজ শুনে আমাকে ডাকেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস! আমি নিবেদন করি, আমি উপস্থিত আছি। [আবু মূসা আশআরীর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি হাজির আছি।] তিনি (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য সম্পর্কে অবহিত করবো না- যা জান্নাতের ধনভাণ্ডারগুলির একটি? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কেন নয়? আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত, অবশ্যই আমাকে বলুন। তিনি (সা.) বলেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ। তিনি (সা.) বললেন, এই বাক্যটি হলো, 'মানুষের মধ্যে না মন্দ থেকে বাঁচার শক্তি আছে এবং মানুষের মধ্যে ভালো কাজ করারও সামর্থ্যও নেই, শুধুমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফিকেই এটি সম্ভব।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২০৫)

এদিকে তিনি (সা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, 'তুমি যে বাক্যটি পড়ছিলে, তা অত্যন্ত উন্নতমানের বাক্য এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে।' যাইহোক, মদীনা অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত ছিল। ইসলামী বাহিনী, যা মদীনা থেকে ৭ম হিজরীর মহররম মাসে যাত্রা করেছিল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হয়ে সফর (মাসের) শেষ দিনগুলোতে বা রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।(গাযওয়াত ওয়াস সারায়া, পৃ: ৩৮৮)

খায়বারে মহানবী (সা.)-এর অবস্থানের সময়কাল নিয়ে মতভেদ পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণ না করেন, মহানবী (সা.) খায়বারে ছয় মাস অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে তিনি দুবেলার নামায একত্র করে পড়াতেন। আবার কোনো কোনে রেওয়ায়েত অনুসারে, তিনি (সা.) সেখানে চল্লিশ দিন ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

বেশিরভাগ রেওয়ায়েতে স্বল্প সময় অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খায়বারের বিজয় মুসলমানদের অনুকূলে অনেক সুফল প্রকাশ পায়। খায়বার বিজয়ের একটি মৌলিক প্রভাব হলো, আরবের আশেপাশের অনেক গোত্র, যারা আগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর কিছু গোত্র তো সন্ধির প্রস্তাব দেয়, কিছু আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়াকেই নিরাপদ জ্ঞান করে, আর এভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। খায়বার বিজয়ের আরেকটি ফলাফল ছিল, আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের শক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মদীনার ইহুদী এবং খায়বারের ইহুদীরা আরব অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো আর বিশেষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষে এতটাই লিপ্ত ছিল যে, কমবেশি প্রায় প্রতিটি বড়ো আক্রমণে শত্রুরা তাদের সমর্থন লাভ করতো।

তৃতীয় মৌলিক প্রভাব ছিল, মদীনার মুসলমানদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীরা বর্ণনা করেন, খায়বার বিজয়ের পরেই আমরা পেট পুরে খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। (এর আগে তো আমরা পেট ভরে খাবারও খেতে পারতাম না।) খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানদের কাছে পানাহার সামগ্রী এতটাই জমা হয়েছিল যে, তারা তাদের আনসার ভাইদেরকে সেই সমস্ত সম্পত্তি ও অংশ ফেরত দিয়ে দেন, যা তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে তখন দিয়েছিলেন যখন তারা দারিদ্র্য ও কষ্টের সাথে মক্কা থেকে হিজরত করে এখানে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.)-র একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে, যাতে এসব বিশদ বিবরণও পাওয়া যায়। তিনি(রা.) বলেন যে, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় এসেছিলেন, তখন তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁদের কাছে কিছুই ছিল না, আর মদীনার আনসারদের কাছে জমি ও পশুসম্পদ ছিল। অতএব আনসাররা এভাবে বণ্টন করেন যে, তারা প্রতি বছর তাদের ফসলের অর্ধেক এই মুহাজিরদের প্রদান করতেন। হযরত আনাসের মা তাঁর ফলদায়ী খেজুর গাছ আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সেবায় উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) সেই গাছটি উম্মে আইমানকে দিয়ে দেন। অর্থাৎ নিজে রাখেন নি, উম্মে আইমানকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে যখন খায়বার থেকে ফেরার পর মুহাজিররা আনসারদেরকে তাদের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দেয়, তখন মহানবী (সা.) হযরত আনাসের মাকে খেজুর গাছটি ফেরত দিয়ে দেন।হযরত আনাস বলেন, যখন আমি উম্মে আইমানকে বললাম যে, এই গাছটি এখন আমাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বলেন, আমি এটি কখনোই ফেরত দেবো না। এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর দেওয়া জিনিস ফেরত দিতে চাইছিলেন না। যাহোক, কারণ যা-ই থাকুক না কেন, তিনি বলেন, আমি এখন এটি ফেরত দেবো না। হযরত আনাস রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মে আইমানকে বলেন, হে উম্মে আইমান! তুমি এই গাছটি দিয়ে দাও, এর বদলে আমি তোমাকে এত এত গাছ দেবো। কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বলেন, এটি প্র থমে আপনি (আমাকে) দিয়েছেন, এটি বরকতময়, আমি এটি দেবো না। এমনকি তিনি (সা.) যখন তাকে দশগুণ গাছ দেওয়ার কথা বলেন, তখন তিনি সেই গাছটি ফেরত দেন।

(বুখারী, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাজলুহা, হাদীস-২৬৩০) (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়া সাইর, হাদীস-১৭৭১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:১৫১)

ইতিহাসে একটি যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় যাকে যাতুর রিকা-র যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধকে মুহারিব এর যুদ্ধ, 'বনু সা'লাবা-র যুদ্ধ' এবং 'বনু আনমার এর যুদ্ধ'ও বলা হয়, কারণ এই গোত্রগুলির পক্ষ থেকে এই যুদ্ধ হয়েছিল। যাতুর রিকা-র যুদ্ধের নাম 'গাজওয়া যাতুল আজীব'ও রাখা হয়েছে, কারণ এই যুদ্ধে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বা মু 'জিযা ঘটেছিল। এই যুদ্ধের নাম 'যাতুর রিকা' রাখার একটি কারণ এটি বর্ণনা করা হয় যে, এই এলাকায় একটি গাছ বা পাহাড় ছিল যার নাম ছিল যাতুর রিকা, তাই এই যুদ্ধের নাম 'যাতুর রিকা'-এর যুদ্ধ হয়ে যায়।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৬) (কিতাবুল মাগাযি, লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

নামকরণের আরেকটি কারণ হযরত আবু মূসা আশআরি বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীদের কাছে বাহন খুব কম ছিল। তিনি নিজেও ছয়জনের মধ্যে একজন ছিলেন যাদের মাত্র একটি বাহন ছিল, যাতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। পাথুরে জমিতে হাঁটার কারণে সাহাবীদের পা আহত হয়েছিল এবং তারা ছেঁড়া পুরানো কাপড় পায়ে জড়িয়ে হাঁটতেন। স্বয়ং হযরত আবু মূসা আশআরি-র শুধু পা-ই আহত হয় নি, বরং তাঁর নখও আহত হয়ে উঠে গিয়েছিল। কাপড়ের পট্টি প্যাঁচানোকে যেহেতু 'রিকা' বলা হয়, তাই এই যুদ্ধের নাম যাতুর রিকা-র যুদ্ধ অর্থাৎ প্যাঁচানো পট্টি-র যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাগাযি, বাব- যাতুর রিকা, হাদীস-৪১২৮)

যাইহোক, এগুলো হলো এর বিভিন্ন নাম। আরেক জায়গায় এটি লেখা আছে যে, যে ভূমিতে এই যুদ্ধ হয়েছিল, সেই ভূমির বিভিন্ন রং ছিল। কেউ কেউ লিখেছেন যে, এই যুদ্ধে বিভিন্ন রঙের ঘোড়া ছিল। কেউ কেউ লিখেছেন যে, এই যুদ্ধে পতাকাগুলোতে পট্টি বানানো হয়েছিল বা বিভিন্ন পট্টি জুড়ে পতাকা তৈরি করা হয়েছিল। এই কারণে এটিকে যাতুর রিকা বলা হয়েছে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খন্ড,পৃ: ৩৭১)(শারাহ যুরকানি,২য় খণ্ড,পৃ: ৫২৫)

কেউ কেউ বলেছেন যে, এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের একত্রীকরণের কারণে একে যাতুর রিকা বলা হয়েছে। এই যুদ্ধের আরেকটি নাম সালাতুল খওফ-এর যুদ্ধও বটে। কারণ এই যুদ্ধে খওফের নামাজ তথা ভয়ভীতির সময়ের নামাজ আদায় করা হয়েছিল। (শারাহ যুরকানি,২য় খণ্ড,পৃ: ৫২১)

এই যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ অনুসারে যাতুর রিকার যুদ্ধ চার বা পাঁচ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। অতএব ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাতে যাতুর রিকা-র যুদ্ধকে বনু নাজিরের যুদ্ধের তিন মাস পরে চার হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সাদ-এর মতে, এটি পাঁচ হিজরিতে হয়েছিল। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬১৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭)

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারি একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য দ্বারা এই যুদ্ধকে খায়বার বিজয়ের পরে সাত হিজরিতে সংঘটিত বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সাক্ষ্য হলো, হযরত আবু মূসা আশআরি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু হযরত আবু মূসা আশআরি খায়বার বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাই সাত হিজরির তারিখ এই যুদ্ধের জন্য বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব গাযওয়াহ যাতির রিকা)

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিয়ীন গ্রন্থের শেষে তাঁর বইয়ের অবশিষ্ট অংশের জন্য যে শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, তাতে যাতুর রিকার যুদ্ধকে খায়বারের যুদ্ধের পরে, সাত হিজরির যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৩৮)

এই যুদ্ধের একটি কারণ ছিল এই যে, নজদ অঞ্চলে কিছু লোক মাঝে মাঝে চুরি ও ডাকাতি করে পথিকদের হয়রানি করত। এই লোকেরা কোনো একটি স্থানে স্থির ছিল না, তাই তাদের দমন করা বেশ কঠিন কাজ ছিল। মহানবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে কার্য কর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৮)

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ এটি বর্ণনা করা হয় যে, একজন লোক বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে মদীনায় এসেছিল। মদীনার লোকেরা তার কাছ থেকে সামগ্রী ক্রয় করে। তখন সে মুসলমানদের বলে যে, বনু আনমার ও বনু সা'লাবা তোমাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে, কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে উদাসীন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন এই খবর পান, তখন মদীনায় একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে সফরের প্রস্তু তি নেন। ইবনে ইসহাক বলেন যে, তখন হযরত আবু যর গিফারিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছিল। ইবনে সাদ ও ইবনে হিশাম বলেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফানকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। (শরাহ যুরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৭–৫২৮)

যাইহোক, তিনি (সা.) এই সফরে বের হন।যুদ্ধের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে আরও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা থেকে চারশ লোকের সঙ্গে বা কিছু বর্ণনা অনুযায়ী সাতশ বা আটশ লোকের সঙ্গে রওয়ানা হন এবং শুকরা উপত্যকায় পৌঁছেন। শুকরা উপত্যকা মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে এক দিন অবস্থান করে চতুর্দিকে দল পাঠানো হয়। রাত পর্য ন্ত সমস্ত দল ফিরে এসে জানায় যে, তারা কাউকে দেখেনি এবং তারা তাদের পায়ের চিহ্নগুলো মুছে দিয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সঙ্গে বের হন এবং নখল পর্যন্ত পৌঁছেন। নখল মদীনা থেকে প্রায় বাষট্টি মাইল দূরে অবস্থিত। যখন তারা সেই গোত্রগুলোর আবাসস্থলে পৌঁছেন, তখন সেখানে নারীদের ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় নি। নারীদের বন্দি করা হয়। কিছু ঐতিহাসিক নারীদের বন্দি করার উল্লেখ করেন নি। তারা বলেছেন যে, কোনো বন্দি করা হয় নি এবং যারা বেদুইন ছিল তারা পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। তারা পাহাড়ের চূড়া থেকে সমস্ত দৃশ্য দেখছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৭৫) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৪)

অর্থাৎ পুরুষরা পালিয়ে যায়, নারীরা সেখানে থেকে যায়। কারো মতে তাদের বন্দি করা হয়েছিল, কারো মতে হয় নি। বেশির ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, নারীদের বন্দি করা হয় নি।হযরত জাবের বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) নখল থেকে যাতুর রিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গাতফান সৈন্যদের সম্মুখীন হন, কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় নি। অবশ্য মুখোমুখি থাকার সময় একে অপরের আক্রমণের ভয় ছিল এবং এই আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুরা যে কোনো মুহূর্তে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে। এই সময়ে, যেহেতু শত্রুপক্ষের আক্রমণের ভয় ছিল, তাই নামাজের সময় হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতুল খওফ অর্থাৎ ভয়ভীতির সময়ের নামাজ আদায় করালেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব গাযওয়া যাতির রিকা, হাদীস-৪১২৭)

অর্থাৎ এমন নামাজ যেখানে কিছু লোক অংশগ্রহণ করে, অর্ধেক লোক প্রথম রাকাতে অংশগ্রহণ করে, অর্ধে ক লোক নামাজের পরের অর্ধেকে এসে অংশগ্রহণ করে, তারপর পিছনে সরে যায় এবং এরপর দ্বিতীয় দল এসে অংশগ্রহণ করে এবং তাঁর (সা.) সাথে নামাজ আদায় করে। এর উল্লেখ কুরআন করিমে সূরা নিসায় পাওয়া যায় যে, এই ধরনের পরিস্থিতি হলে ভয়ের অবস্থায় কীভাবে নামাজ পড়তে হয় যাতে শত্রু আক্রমণ না করে। বায়হাকী হযরত জাবের (রা.) থেকে রেওয়াত করেছে, রসূলুল্লাহ (সা.) যোহরের নামায পড়িয়েছিলেন। মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সংকল্প করে এবং বলতে থাকে, এখন তাদের ছেড়ে দাও এরপর আরেকটি নামায রয়েছে যা তাদের নিজেদের পুত্রের চেয়েও বেশি প্রিয়। জিবরাইল রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলেন এবং শত্রুদের দুরভিসন্ধির সংবাদ দিলেন। একটি নামায ছেড়ে দিয়েছিল তারা পরবর্তী নামাযে আক্রমণ করবে বলে। যাহোক এটি একটি রেওয়াত। সুবুলুল হুদা'তে রয়েছে শত্রুদের দুরভিসন্ধির সংবাদ জিবরাইল (আ.) রসূলুল্লাহ (সা.) কে দিলেন, তিনি আসরের সময় সালাতে খওফ পড়িয়েছিলেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, এটি প্রথম সালাতে খওফ ছিল যা তিনি (সা.) পড়িয়েছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৭৫)

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী লিখেছেন, ভীতির সময়ের নামাযের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কোন্ বছর প্রথমবার এই বিষয়ে আদেশ নাযেল হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত হলো প্রথমবার যাতুর রিকা' এর যুদ্ধে এই নামাযটি আদায় করা হয়েছিল। তবুও কোন্ বছর এই আদেশ নাযেল হয়েছিল সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ চার হিজরী, কেউ পাঁচ হিজরী, কেউ ছয় হিজরী, কেউ সাত হিজরী বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী সালাতুল খওফ বা ভীতির সময়ের নামায গাযওয়া বদরুল মওউদ এর পূর্বে প্র থমবার আদায় করা হয়েছিল, যেটি চার হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

(উমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৭৬) (ফতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৮–৩৪৯)

এই সময়ে এক ব্যক্তির সাহাবীদের ওপর আক্রমণ করার ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) এক রাতে একস্থানে শিবির স্থাপন করেন। সে সময় তীব্র বাতাস বইছিল, তিনি সাহাবীদের বললেন, কে আছে যে আজ রাতে আমাদের জন্য পাহারা দিবে? এতে হযরত আব্বাদ বিন বিশর ও হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) দাঁড়ালেন ও বললেন, আমরা আপনার জন্য পাহারা দিবো। এরপর তারা উভয়ে গিরিপথের চূড়ায় বসে পড়লেন। হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে (রা.) বললেন, রাতের প্র থম অংশে আমি পাহারা দিবো আর তাকে বললেন, তুমি শুয়ে পড়। আর শেষ রাতে তুমি পাহারা দিও যেন আমি শুতে পারি। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের তো শুয়ে পড়লেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। তিনি নামায পড়ছিলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, রাতে শত্রুপক্ষের এক লোক তাকে দেখে ফেললো। গিরিপথে হযরত আব্বাদ বিন বিশরের (রা.) ছায়া দেখতে পেল, নামায পড়ছিলেন, নড়াচড়া হচ্ছিলো। এতে সে নিশ্চয় চিন্তা করলো মুসলমানদের কোন ব্যক্তি হবে যে পাহারা দিচ্ছে। সে এটাই চিন্তাকরে থাকবে। সে নিজের শত্রু মনে করে তীর নিক্ষেপ করলো। হযরত আব্বাদ বিন বিশরের (রা.) শরীরে তীর বিদ্ধ হলো। হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) নামায পড়ছিলেন, এতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তীর বের করে ফেলে দিলেন। নামায ছেড়ে দিলেন না বরং নামাযরত অবস্থায় তীর বের করে ছুঁড়ে ফেললেন। নামায অব্যাহত রাখলেন। সে পুনরায় দ্বিতীয় তীর ছুঁড়লো। সেটাও তাঁকে বিদ্ধ করলো। তিনি সেটিকেও বের করে ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর যখন সে তৃতীয় তীর ছুঁড়ে মারলো তখন হযরত আব্বাদ বিন বিশরের (রা.) অনেক রক্ত প্রবাহিত হলো। তিনি নামায সম্পন্ন করলেন এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে (রা.) ডেকে তুললেন। যখন সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখতে পেলো তখন পালিয়ে গেলো। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) যখন হযরত আব্বাদ বিন বিশরকে (রা.) আহত অবস্থায় দেখলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে পূর্বে ই কেন জাগালে না? তিনি বললেন, আমি নামাযে সূরা কাহাফের তিলাওয়াত করছিলাম, আর আমার মন চাচ্ছিলো না যে আমি এর তিলাওয়াতকে বাধাগ্রস্থ করি।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৮–৩৬৯) (আসীরাতুন নববীয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৬১৭–৬১৮)

তাদের মাঝে এটি এক অদ্ভূত সম্পর্ক ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে; নিষ্ঠা ছিল, বিশ্বস্ততা ছিল, ইবাদতের আগ্রহ ছিল। ক্ষতের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি। কোন কোন রেওয়াতে এটিও রয়েছে যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরের (রা.) গায়ে তীর লেগেছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৮০)

যাইহোক পনেরো দিনের এই অভিযানের পর রসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার দিকে ফেরত রওনা হলেন। তিনি জোআল বিন সুরাকাকে (রা.) মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করলেন যেন তিনি মদীনাবাসীদেরকে মুসলামানদের নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দেন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০)

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছালেন যা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত তখন উট জবাই করার নির্দেশ দিলেন। আর দিনভর সেখানে অবস্থান করেন এবং অন্যান্য মুসলমানরাও তাঁর (সা.) সাথে ছিল। সন্ধ্যার সময় মহানবী (সা.) মদীনায় প্রবেশ করেন তখন আমরাও তাঁর (সা.) সাথে ছিলাম।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৮০) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭)

এই যুদ্ধে কিছু মোজেযা [তথা অলৌকিক নিদর্শন]ও প্রকাশ পেয়েছিল যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এটি মোজেযা অভিযান নামেও পরিচিত। শত্রু কর্তৃক তরবারি দ্বারা মহানবী (সা.) এর ওপর আক্রমণের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

(সা.) এর সাথে নজদ অভিমুখে এক যুদ্ধে যান। লোকেরা খুব কাঁটাযুক্ত এক উপত্যকায় দুপুরে পৌঁছায়। মহানবী (সা.) সেখানে শিবির স্থাপন করেন। তখন দুপুর হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা গাছের ছায়ার খোঁজে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) বাবলা গাছের নিচে বিশ্রাম করেন এবং নিজ তরবারি ঝুলিয়ে রাখেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর দেখলাম মহানবী (সা.) আমাদের ডাকছেন। আমরা তাঁর (সা.) কাছে গিয়ে দেখতে পাই যে একজন বেদুইন তাঁর (সা.) পাশে বসে আছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন এই ব্যক্তিটি আমার তরবারি নিয়ে নেয়। আমি সজাগ হয়ে দেখতে পাই সে আমার দিকে তরবারি তাক করে রেখেছে। সে আমাকে বলে, তোমাকে আমার হাত থেকে এখন কে বাঁচাবে? আমি বললাম, আল্লাহ। সে তখন তরবারি খাপবন্ধ করে নেয়। এই সেই ব্যক্তি যে এখানে বসে আছে। মহানবী (সা.) সেই হামলাকারীকে কোনো ধরনের শাস্তি দেননি।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-২৯১৩) (সহীহ বুখারী কিতাবুল মাগাজি, হাদীস-৪১৩৫)

এই ব্যক্তির নাম গওরস বিন হারেস বর্ণিত হয়েছে। কেউ তার নাম গওরক উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার গওয়ারিস উল্লেখ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১৩৬) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯) (শারাহ যুরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩২)

এই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বর্ণনায় এসেছে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আবার কোথাও বলা হয়েছে সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। তবে সে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, ভবিষ্যতে সে কখনও মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে না।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৬৯) (শারাহ যুরকানি, ২য় খন্ড, পৃ: ৫৩০)

মহানবী (সা.) এর ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণকারীর আরেকটি ঘটনা বর্ণনা পাওয়া যায়। যেখানে দোসুর নামক এক ব্যক্তির মহানবী (সা.) এর ওপর আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে। কিছু আলেম এই দুই ঘটনাকে একই ঘটনা বলে মনে করেন, আবার কেউ মনে করেন এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৬৯)

দোসুরের হামলার ঘটনা হিজরী তৃতীয় সনের গাযওয়া যি আমর অথবা গাযওয়া বনু গাতফান থেকে ফেরার পথে ঘটেছিল। মুশরিকরা মহানবী (সা.) কে একস্থানে একা শুয়ে থাকতে দেখে তাদের সর্দার দোসুরের কাছে যায়। এই ব্যক্তি (দোসুর) তাদের সকলের মাঝে সবচেয়ে সাহসী ছিল। মুশরিকরা তাকে বলে এই মুহূর্তে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একাকী শুয়ে আছে, এখন তোমার কাজ হলো তার সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়া। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে দোসুর নিজেই মহানবী (সা.) কে শায়িত অবস্থায় দেখে বলতে আরম্ভ করে, এখন যদি আমি মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা না করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ধ্বংস করে দিবেন। যা হোক দোসুর এই কথা বলা মাত্রই তরবারি তাক করে একদম মহানবী (সা.) এর মাথার পাশে গিয়ে থামে। অতঃপর আচমকা মহানবী (সা.) কে সম্বোধন করে বলে, আজ অথবা এটি বলেছে যে, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? মহানবী (সা.) শান্তভাবে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবেন। এরপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর তার তরবারি হাত থেকে পড়ে যায়। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ তরবারি হাতে তুলে নিলেন আর বললেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? দোসুর বলে, লা! কেউ না। এখন কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি ভবিষ্যতে কখনও আপনার বিরুদ্ধে লোকদের সমবেত করবো না। মহানবী (সা.) তার তরবারি তাকে ফেরত দিলেন। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, দোসুর তাঁকে (সা.) উদ্দেশ্য করে নিবেদন করে, আল্লাহর কসম! দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে উত্তম। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, أَنَا أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكَ আনা আহাক্কু বিযালিকা মিনকা। আমি অনুগ্রহ প্রদানের ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখি। আর দোসুর নিজ জাতির কাছে ফিরে আসে, কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। সে নিজ জাতির মাঝে তবলীগ করছিল। দোসুর ঘটনা বর্ণনা করছে যে, আমার সাথে কী ঘটেছিল, আমি কীভাবে পড়ে গিয়েছিলাম? সে পড়ে যাবার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করে বলে, আমি সেখানে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখলাম। সেখানে যখন আমি তরবারি শাণিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখি, অনেক দীর্ঘকায় একজন ব্যক্তি সেখানে আসে, সে আমাকে ধাক্কা দেয় আর আমি পিঠের দিকে পড়ে যাই। সে সময় আমি বুঝে যাই, এটি কোনো মানুষ নয়, এ তো কোনো ফেরেশতা। আর আমি তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ সত্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) হলেন আল্লাহ্‌র রসূল। সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো ষড়যন্ত্র করব না। এরপর সে নিজ জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করে। একস্থানে এভাবেও ঘটনাটি লেখা আছে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৬৯, ২৯০) (সুবুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৬, ১০ খণ্ড, পৃ: ২৫৭-২৫৮)

সেখানে একটি পাখিরও ঘটনা ঘটে। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি পাখির বাচ্চাদের ধরে নিয়ে আসে আর মহানবী (সা.) তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই পাখির বাচ্চার মা কিংবা বাবা অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন, মাবাবা দুইজনই ছিল অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন সেই সাহাবীর সামনে গিয়ে পড়ে যায়, যিনি তার বাচ্চাদের ধরেছিলেন। পাখির বাচ্চাদের ধরেছিল বিধায় মা অথবা বাবা পাখিটি আসে এবং তাদের সামনে নিজেকে সমর্পিত করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি লক্ষ করি, লোকেরা অবাক হচ্ছিল, অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হচ্ছিল যে, এটি কী হলো- পাখিটি নিজেই এসে বসে গেল! তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা এই পাখিটি দেখে অবাক হচ্ছো যে, এটি কেন বাচ্চাদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে! তোমরা তার বাচ্চাদের ধরেছ আর সে নিজে নিজেই তার বাচ্চাদের ছাড়ানোর জন্য নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু এই পাখির চেয়েও বেশি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। (আমতাউল আসমা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৭৫)

এটি যেভাবে নিজের বাচ্চাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি এর চেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

এই মুজিযাসমূহের মাঝে এক পাগল বাচ্চার আরোগ্য লাভের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণ না করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যাতুর-রিকা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একজন গ্রাম্য মহিলা নিজের ছেলেকে সাথে নিয়ে আসে এবং নিবেদন জানায়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি আমার ছেলে এবং এর ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ পাগলামি পেয়ে বসে তাকে। পাগলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি (সা.) তার মুখ খোলেন এবং তাতে (তাঁর মুখের) লালা দেন আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! দূর হয়ে যা। তিনি (সা.) এই দোয়া করেন। আমি আল্লাহ্‌র রসূল। এই বাক্যাবলি তিন বার বলেন। তারপর বলেন, এই বাচ্চাকে নিয়ে যাও এবং এই কষ্ট আর কখনো হবে না।

(আমতাউল আসমা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬০)

তিনটি ডিমের মাঝে বরকত-সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। উট পাখির ডিম ছিল। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, যাতুর-রিকা যুদ্ধে উরওয়া বিন যায়েদ হারসি তিনটি ডিম নিয়ে আসেন, যা উট পাখির ডিম দেবার স্থানে পড়ে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে জাবের! এগুলো নিয়ে নাও এবং এই ডিমগুলো রান্না করো। আমি সেগুলো রান্না করি আর একটি পাত্রে এগুলো নিয়ে আসি। তারপর আমি রুটির খোঁজ করি কিন্তু পাওয়া যায় নি। মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা রুটি ছাড়াই তা খেতে আরম্ভ করেন, এমনকি তাঁরা পরিতৃপ্ত হয়ে যান। পেট ভরে যায় আর পাত্রে ডিম সেভাবেই থেকে যায় যেভাবে প্রথমে ছিল। অতঃপর আরো অনেক সাহাবী সেখান থেকে খান এবং তারপর আমরা সামনে অগ্রসর হই।

(আমতাউল আসমা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২১)

এখানে একটি উটের ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়, যেটি তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণি ত, আমরা যাতুর-রিকা যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পথে যখন হাররা নামক স্থানে পৌঁছাই তখন দ্রুতবেগে একটি উট ছুটে আসে এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে শুরু করে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো এই উট কি বলছে? এই উট তার মালিকের বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ করছে। এর মালিক বেশ কয়েক বছর ধরে একে কাজে লাগাচ্ছে আর এখন সে একে জবাই করতে চায়। হে জাবের! এর মালিকের কাছে যাও আর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। হযরত জাবের বলেন, আমি বললাম, আমি তো এর মালিককে চিনি না। তিনি (সা.) বলেন, এই উট তোমাকে তার মালিকের কাছে নিয়ে যাবে। এই উটকে ছেড়ে দাও, সে নিজেই তার মালিকের কাছে চলে যাবে। অতএব সেই উট তাকে নিয়ে চলে গেল আর অবশেষে মালিকের কাছে পৌঁছে দিল। তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে তাঁর (সা.) কাছে নিয়ে আসি এবং মহানবী (সা.) তার সাথে উটের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। মহানবী (সা.) বলেন, এই উট আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আর সে উটটি

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

তাঁর (সা.) কাছে বিক্রি করে দিল। তিনি (সা.) সেটিকে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে চরার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেন। (মুজামুল আওসাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৪)

এ প্রেক্ষিতে হযরত জাবের (রা.)-এর উট হারিয়ে যাওয়ার ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, এক অন্ধকার রাতে আমার উট হারিয়ে যায়। আমি মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার উট হারিয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উট অমুক জায়গায়, সেখানে যাও এবং উট নিয়ে আসো। আমি সেদিকে গেলাম কিন্তু উট পেলাম না। আমি ফিরে আসলে তিনি (সা.) আবার একই কথা বললেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আবার গেলাম কিন্তু এবারও আমি উট পেলাম না। তাই ফেরত আসলাম। তখন তিনি (সা.) স্নেহের স্বরে বললেন, আমার সাথে চলো। তিনি আমার সাথে গেলেন এবং আমরা উটের কাছে পৌঁছালাম আর তিনি (সা.) উট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

তার অলস উটেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের সম্পর্কে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমার উট ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মহানবী (সা.) আমার কাছে আসলেন আর বললেন, হে জাবের! আমি বললাম, জি! তিনি (সা.) বললেন, কী হয়েছে? আমি নিবেদন করলাম, আমার উট ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে আর আমি পিছিয়ে পড়েছি। তিনি (সা.) নিজ বাহন থেকে নামলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, জি আছে। এরপর আমি পানির একটি পাত্র নিলাম। তিনি (সা.) এর মাঝে ফুঁ দিলেন এবং আর সেই উটের মাথা, কোমর ও পিঠে ছিটিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, আমাকে একটি লাঠি দাও। আমি তাকে আমার লাঠি দিলাম অথবা বললেন, আমি গাছ থেকে একটি কঞ্চি কেটে দিলাম। যাহোক, সেই উটকে তিনি (সা.) কয়েক ঘা দিলেন এবং নিজ লাটি দ্বারা সেটিকে হাঁকাতে লাগলেন। এরপর বললেন, আরোহণ করো। আমি আরোহণ করলাম। সেই উটে চড়ে বসলাম। আমি লক্ষ করলাম, সেই উট এতটাই দ্রুততার সাথে ছুটতে শুরু করল যে, আমি তখন মহানবী (সা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছিলাম। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে চলছিলাম আর তিনি (সা.) আমার সাথে কথা বলছিলেন। আর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি জবাব দিলাম, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়েকে নাকি বিধবাকে? আমি বললাম, বিধবা নারীকে। তিনি বললেন, যুবক হয়ে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তুমি নিজেও যুবক, তুমি তার সাথে খেলতে পারতে, সে-ও তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারত। আমি নিবেদন করলাম, আমার বেশ ক'জন বোন রয়েছে। হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তার ০৭ জন কন্যা সন্তান ছিল যারা জাবের (রা.)-এর বোন ছিল। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমার কয়েকজন বোন আছে আর আমি ভাবলাম, আমি এমন কোনো নারীকে বিয়ে করব যে তাদের মনস্তুষ্টি করবে, তাদের চুল আঁচড়িয়ে দিবে, ঝুঁটি করে দিবে আর তাদের লালন-পালন করবে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, এখন তুমি বাড়ি পৌঁছাতে যাচ্ছ। (বাড়ি) যখন পৌঁছাবে তখন বুদ্ধিমত্তার সাথে, সাবধানতার সাথে কাজ করবে। এই উপদেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার এই উট বিক্রয় করবে? আমি বললাম, জ্বি, হ্যাঁ। তখন তিনি (সা.) সেটি আমার কাছ থেকে এক আওকিয়া রূপার বিনিময়ে ক্রয় করেন। এরপর মহানবী (সা.) আমার পূর্বে মদীনাতে পৌঁছান আর আমি পরবতী দিন সকালে পৌঁছাই। আমি মসজিদে আসলে তাঁকে (সা.) মসজিদের দরজায় পাই। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, এখনই পৌঁছলে? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উট ছেড়ে দাও আর মসজিদে গিয়ে দু -রাকাত নামায পড়ো। অতএব, আমি ভিতরে প্রবেশ করি আর নামায পড়ি। এরপর তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, তাকে এক আওকিয়া রূপা মেপে দাও। (এটি) সেই উটের মূল্য যা পথের মাঝে নির্ধারিত হয়েছিল। হযরত বেলাল (রা.) (রূপা) মেপে আমাকে দিয়ে দেন এবং কিছু অতিরিক্তও দেন। এরপর আমি যখন ফিরে যাচ্ছিলাম তখন তিনি (সা.) বলেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। জাবের (রা.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এখন মহানবী (সা.) আমার উট ফিরিয়ে দেবেন আর আমার কাছে এটি ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় আর কোনো অপছন্দনীয় বিষয় ছিল না। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উটও নিয়ে নাও আর এর মূল্যও নিজের কাছে রাখো। অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.)-এর ভাবনা তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ছিল যে, উট ফিরিয়ে দেবার ফলে হয়ত (উটের) মূল্যও ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, মূল্যও রাখো আর উটও রাখো। তিনি (সা.) উটের মূল্য ফিরিয়ে নেন নি।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-২০৯৭)

অলৌকিক নিদর্শনাবলির মাঝে অল্প পানি বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, সেই যুদ্ধাভিযানের মাঝেই একবার মহানবী (সা.) বলেন, হে জাবের! ওযুর জন্য ঘোষণা দাও। আমি বললাম, শুনো! ওযু কর, ওযু, ওযু। আমি মানুষের মাঝে এই ঘোষণা করে দিই। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এই নিবেদন করি, এখন আমাদের কাছে কাফেলার মাঝে এক বিন্দুও পানি পাই নাই। তিনি (সা.) বলেন, অমুক ইবনে অমুক আনসারীর কাছে যাও আর দেখো তার মশকে কিছু আছে কিনা। তিনি (রা.) বলেন, আমি সেই দিকে যাই আর সেগুলো দেখলাম তো তার মশকগুলোর মাঝে একটির মুখে (পানির) একটি বিন্দু ছিল অর্থাৎ খুবই সামান্য পানি ছিল। আমি যদি সেটি কাত করে ঢালতাম তবে এর শুষ্ক স্থান তা শুষে নিত। এতটুকু ছিল যে, সেটি থেকে তা বের করাই দুষ্কর ছিল। অতঃপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই মশকের মুখে আমি শুধুমাত্র এক বিন্দু পানি পেয়েছি, খুবই সামান্য (পানি)। আমি যদি এটি কাত করে ঢালি তবে এর শুষ্ক স্থান তা শুষে নিবে। তিনি (সা.) বলেন, সেটি আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি সেটি তাঁর (সা.) কাছে আনলাম। তিনি (সা.) সেটি নিজের হাতে ধরলেন এবং কিছু বলা আরম্ভ করেন, দোয়া করেন। আমি জানি না কী বলেছেন। তিনি (সা.) সেটি নিজের হাতে চাপতে থাকেন। এরপর তিনি (সা.) আমাকে সেটি দিয়ে বলেন, হে জাবের! একটি বড় পাত্র নিয়ে আসো। আমি বড় পাত্র নিয়ে এসে তা তাঁর (সা.) সামনে রাখলাম। মহানবী (সা.) বড় পাত্রে এভাবে হাত ওঠান। পাত্রে এভাবে হাত ওঠান আর এভাবে প্র সারিত করেন। এবং নিজের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দেন, অর্থাৎ পাত্রে এভাবে হাত প্রসারিত করেন। এরপর নিজের হাত পাত্রের তলানিতে রেখে দেন। প্রথমে পুরো হাত প্রসারিত করেন এরপর নিজের হাত নিচে তলানি পর্যন্ত নিয়ে যান। এবং বলেন, হে জাবের! নাও, আমার হাতের ওপর ঢালো এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করো। পানির যতটুকু ফোঁটা আছে তা আমার হাতে ঢেলে যাও। আমি তা মহানবী (সা.)-এর হাতে ঢালি এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করে আমি পানিকে দেখলাম যে, তাঁর (সা.) আঙ্গুলের মাঝে পানি ঝর্ণা র ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে, এমনকি সেটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, হে জাবের! প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে ডাকো যার পানির প্রয়োজন আছে। তিনি (রা.) বলেন, লোকেরা এসে পানি পান করে, এমনকি তারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।তিনি বলেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করি আর কারও পানির প্রয়োজন আছে কি? অতপর মহানবী (সা.) পাত্র থেকে নিজের হাত বের করেন আর সেটি পানিতে পরিপূর্ণ ছিল। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রিকাইক, হাদীস-৩০১৩)

মহানবী (সা.)-এর এরূপ অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:এই পর্যায়ের লেকায় (তথা ঐশী সাক্ষাতে) মাঝে মাঝে মানুষের দ্বারা এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে আর এর মাঝে এক প্রকার ঐশী শক্তির রং দেখা যায়। যেমন আমাদের পিয় নেতা ও প্রিয়তম, নবীদের সর্দার হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদর যুদ্ধের সময় এক মুঠো কঙ্কর কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারেন এবং এটি কোনো দোয়ার মাধ্যমে ছিল না বরং তাঁর আত্মিক শক্তির মাধ্যমে ছিল। কিন্তু সেই মুঠোর মধ্যে একপ্রকার ঐশী শক্তি প্রকাশ পেল, যার প্রভাবে এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল যে, কাফিরদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার চোখে এই কঙ্করের প্রভাব পড়ে নি। সবাই অন্ধের মত হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্তি ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হল যে, তারা মাতালের মতো ছুটে পালাতে লাগল। এই অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (সূরা আনফাল: ১৮) অর্থাৎ 'তুমি যখন নিক্ষেপ

এরপর শেষের পাতায়...

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে নিরাপত্তা- হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে

কে তারিক আহমদ. এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া অনুবাদক: জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ-বাংলাডেস্ক, কাদিয়ান

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অসুসরণ করে; এবং যে বিপথগামী হয় সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসুল পাঠাই। (বনী ইসরাঈল: ১৬)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন:"ঐ দিন আকাশ হতে একটি সুস্পষ্ট ধোঁয়া অবতীর্ণ হবে। ঐদন ভূপৃষ্ঠ ধূসর হয়ে যাবে, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের চিহ্নাবলী প্রকাশিত হবে। বিরুদ্ধবাদীরা তোমাকে লাঞ্ছিত করার পর আমি আমাকে সম্মান দিব এবং তোমাকে সম্মানিত করব। তারা চাইবে যে, তোমার কর্ম সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ থাকুক। কিন্তু খোদা তোমাকে ছেড়ে দিতে চান না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সকল কর্ম সম্পূর্ণ না হবে। আমি অযাচিতভাবে দাতা। আমি সকল ব্যাপারে তোমাকে সুবিধা দেব। সব দিক থেকে আমি তোমাকে বরকত দেখাব।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ: ৯৮)

অপর এক জায়গায় সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"অতবে হে শ্রোতাগণ! তোমরা স্মরণ রেখো! এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি শুধু সাধারণভাবে পূণ হয়, তাহলে তোমাকে খোদার প্রেরিত পুরুষ বলে মনে করো না। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কালে যদি পৃথিবীতে এক মহাবিপর্যয় উপস্থিত হয়, ব্যাকুলতার আতিশয্যে মানুষ পাগলের মত হয়ে যায় এবং অধিকাংশ স্থলে অট্টালিকাগুলি এবং প্রাণীকুল ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে তোমরা সে খোদা সম্বন্ধে ভীত হও, যিনি আমার জন্য এসব প্রদর্শন করেন। "

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ:৩৯৬)

বন্ধুরা! এর কিছু একটা প্রতিকার করো, হে উদাসীনেরা! আকাশ এখন আগুন বর্ষণ করবে।

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে প্রতিটি মানুষই নিরাপত্তাহীনতার শিকার এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত হচ্ছে এটা তারা শুনছে এবং সচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। যুদ্ধের শিখা জ্বলে উঠেছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে। আজকের যুগে খোদার একটি ক্রোধজনক প্রকাশ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আকারে দেখা দিতে পারে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ধরণের যুদ্ধের ক্ষতি এবং ধ্বংস শুধুমাত্র একটি প্রচলিত যুদ্ধ বা বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, এর ভয়াবহ পরিণতি আগামী প্রজন্মের মধ্যেও প্রকাশ পেতে থাকবে।

শেষ যুগের ইমাম, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জীবন মুসলমানদেরকে তথা সমগ্র বিশ্বকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি তারা তওবা না করে এবং সত্য খোদা ও তাঁর রসুল (সা.) এবং যুগের ইমাম-এর প্রতি ঈমান আনে তবে তারা আল্লাহর কঠিন শাস্তিতে গ্রেপ্তার হবে।

শ্রোতামণ্ডলী! পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, নূহের জাতি শিরক ও মূর্তিপূজার কারণে ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়েছিল। অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার কারণে আদ জাতি প্রবল তুফানের কবলে পড়েছিল। আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন স্বরূপ উটকে ক্ষতির করার কারণে বিকট চিৎকার ও ভূমিকম্পে সামুদ জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। অনৈতিকতা ও সমকামিতার কারণে লুত (আ.)-এর জাতির দেশ বাসভূমি ওলট পালট হয়ে যায়। পরিমাপের অস্বচ্ছতা ও প্রতারণার কারণে আইকার বাসীদের উপর তীব্র তাপ ও ভূমিকম্প নেমে এসেছিল।

কিন্তু বর্তমান যুগে সেই সর্বশক্তিমান খোদা দীর্ঘকাল নীরব ছিলেন এবং তাঁর চোখের সামনে অতীতের সকল জাতির জঘন্য কাজকর্ম চলতেই থাকে। আমরা যখন আজকের পৃথিবীর দিকে তাকাই, তখন এটা বলা সঙ্গত হবে যে, অতীতের জাতিগুলোর উপর খোদার ক্রোধ সৃষ্টিকারী অমঙ্গল আজকের যুগে পাওয়া যায়। কুফর ও শিরক চরমে পৌঁছেছে, আল্লাহ্র নবীদের শুধু অস্বীকার করা হচ্ছে না, তাদের প্রতি অবজ্ঞার ঝড় বয়ে যাচ্ছে এবং শালীনতা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ইতিহাস এখন আবারও এই অন্ধকার অধ্যায়ের পাতা উল্টে যাচ্ছে। আর খোদার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এ যুগের চিত্র আঁকতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমি সত্য সত্যই বলছি এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের সময়ের চিত্র তোমাদের চোখের সামনে আসবে এবং লুতের দেশের ঘটনাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। সুতরাং অনুতপ্ত হও, যাতে খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করেন। যে খোদাকে ত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়, মৃত।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬৯)

মৃত্যুর পথে এখন কিছুটা ধর্মের সাহায্য লাভ হবে, অন্যথায় বন্ধুরা! ধর্ম হল একদিন মৃত্যু বরণ করারই নামান্তর।

শ্রোতামণ্ডলী! আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং মহান খলীফাগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এই সত্যে উপনীত হয়েছি যে, তৃতীয় বৈশ্বিক বিপর্যের চূড়ান্ত পরিণতি হবে ইসলামের বিশ্বজনীন আধিপত্যের সূচনা এবং এর পর ইসলাম দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে এবং মানুষ বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করবে এবং জানবে যে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম,এবং মানুষের পরিত্রাণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র রসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণীর মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

অতএব, মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, এমন অবস্থায় একজন মোমিনের উচিত মহান আল্লাহ্র দিকে আগের চেয়ে বেশি বেশি করে অবনত হওয়া। আর আল্লাহ্ তা'লার পথের সন্ধান দিতে তাঁর একজন নিষ্ঠাবান সেবক প্রেরণ করেছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন -

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করলেন, এবং তোমরা তাঁরই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে এটি হতে রক্ষা করলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

আর আজ সেই একই খোদার দূত হযরত খলীফাতুল মসীহ রূপে বিভিন্ন কথায় বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের পথ প্রদর্শন করে চলেছেন। এই নির্দেশনা, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (আ.) -এর শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত,যা আমাদের সকল প্রকার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার এবং আমাদের জীবনের জন্য, যা চিরকাল স্থায়ী হতে চলেছে, এবং যদি আমরা সেসব অনুসরণ করি, তবে এটি সেরা ফলাফল তৈরী করবে।

তাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুফল থেকে বাঁচার জন্য মানুষের সর্বশক্তিমান খোদার সামনে অবনত হওয়া এবং সর্বশক্তিমান খোদাকে নিজের সহায় ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিগত দুই দশক ধরে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেল বিপদ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে আসছেন এবং জামাতের সদস্যদের দোয়ার পাশাপাশি তাদের সংশোধন ও তরবীয়তের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন, যাতে জামাতের সদস্যরা এই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব থেকে নিজেকে এবং নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে পারে।

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) ৭ই অক্টোবর ২০১৬ সালের জুমআর খুতবায় বলেন:

অতএব, পৃথিবীতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তা একথা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে,পৃথিবীর পরিণাম কী হতে যাচ্ছে? সম্প্রতি এক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এখন আমাদের কী হবে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একটি পঙক্তির মধ্যেও এর উত্তর দিয়েছেন। এখানেও এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, "সর্বত্র আগুন বিরাজ করছে, কিন্তু এমন সবাইকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, যারা মহাবিশ্বের অধিপতি খোদাকে ভালবাসে।"

(দুররে সমীন,উর্দু, পৃ: ১৫৪)

অতএব, এটিই হল মূল কথা। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ়

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

করতে হবে। আর খোদার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি তাঁর বান্দাদের অধিকারও আমাদের প্রদান করতে হবে। সেসব পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে,যা খোদা নির্ধারিত নীতি অনুসারে পুণ্য বলে গণ্য হয় এবং পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেই সব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে,যা খোদার দৃষ্টিতে পাপ আর যেগুলোর কথা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সত্তায় ঈমান আনার পর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়তর হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই সব বিষয়ই আমাদের মুক্তির কারণ হবে। আর এসব বিষয়ই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। .... তাই,হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলী দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।"

সুধীবৃন্দ! মসজিদে ফজল লন্ডনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার ধ্বংসের কু-প্রভাব থেকে বাঁচতে আল্লাহ্র হক ও বন্দাদের হক আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হুযুর বলেন:

"অবশ্যই , আমরা একটি অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং বিশ্বে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় আমাদের কর্ম ও ভূমিকার দিকে নজর দিতে হবে, খোদার সৃষ্টি হিসেবে আমাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। এটাই সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আনতে পারি, এটাই সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে মানবতা তার স্রষ্টার চরণে আসতে পারে। একজন মুসলিম হিসেবে, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই জীবন একটি অস্থায়ী জীবন এবং পরকাল হল আসল জীবন যেখানে আমাদের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। এই অর্থে, আমাদের দেখতে হবে আমরা আমাদের আগামীকালের জন্য কি পাঠাচ্ছি। বিশ্ব যে দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে তা বন্ধ করতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। পারমাণবিক ধ্বংসের এই পথ, যে পথে পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলেছে,একে সময়মতো থামানো না গেলে পৃথিবীর ভবিষ্যত প্রজন্ম এর ভুক্তভোগী হবে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি বিশ্বকে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে যার ফলশ্রুতিতে, ভবিষ্যত প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তাই, আজকে দেখতে হবে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কি ধরনের পৃথিবী এবং কী ধরনের পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মানুষের অন্তরে তাঁর ভালবাসা ও তাঁর সৃষ্টির ভালবাসা জাগ্রত করুন। অবশ্যই, এই মসজিদ ফজল যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহান আল্লঅহ্ তা'লার অশেষ রহমতে আমরা একশত বছর পরও সেই লক্ষ্যে সচেষ্ট রয়েছি এবং সেই লক্ষ্যেই আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমান-আকিদার উর্ধ্বে গিয়ে সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ আমাদের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করার তৌফিক দান করুন।

(আল ফজল, নভেম্বর৮, ২০২৪)

ভূমিকম্প কেন আসবে না, খোদাভীতির পথ যে বিলুপ্ত হয়েছে। এমনকি মুসলমানকে শুধু নামমাত্র মুসলমান বলা যায়।

সুধীবৃন্দ! যুদ্ধের অশুভ প্রভাব এড়াতে, আমাদের তাকওয়ার মান বাড়াতে হবে, যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৫ই মার্চ, ২০২৪, শুক্রবারের খুতবায় বলেছেন:

"আল্লাহ্ আমাদেরকে যুদ্ধ এবং এর বিপজ্জনক পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে আহমদীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। আল্লাহ্ তাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন। এ থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে তার তাকওয়ার মান বাড়াতে হবে এটাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।"

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! আহমদীদের মনোবল এত বেশি হওয়া উচিত তারা এই বিশ্বের কু-প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্যকেবল নিজেদের এবং নিজেদের আত্মীয়দের নিয়েই চিন্তা করবে না,বরং জামাতের সদস্যদের সার্বজনীন দায়িত্ব হল মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২রা মে, ২০২২ তারিখে তাঁর ঈদুল ফিতরের খুতবায় বলেছেন-

"পৃথিবীর আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং পৃথিবীকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের। বিশ্ব মানবাধিকারের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় এমনটা হচ্ছে। বিশ্বে নাগরিক অধিকার যদি পরিশোধ করা হতো, তাহলে আমরা ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে ধ্বংস দেখতে পেতাম না। এটিও অলীক কল্পনা যে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না,তবে আলোচনা হচ্ছে এবং কেউ এর গ্যারান্টি দিতে পারে না। যাইহোক, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এখন আহমদীদের দায়িত্ব মানবাধিকার আদায়ের প্রতি মানুষকে মনোযোগী করা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অযথা কথা বলে সময় নষ্ট না করে মানুষকে আল্লাহকে ডাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত যে, একমাত্র মহান আল্লাহ্র হুকুম পালন করলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাই এই পদ্ধতিটিও তবলীগের নতুন পথ উন্মুক্ত করবে।

(ঈদ উল ফিতরের খুতবা, ২রা মে,২০২২)

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) আহমদী ডাক্তার এশোসিয়েশনের ভাষণ প্রদান কালে বলেছেন:

"আমরা যে অস্থির সময়ে বাস করছি,যুদ্ধের ঘন মেঘ আমাদের মাথার উপর ক্রমাগত ঘোরাফেরা করছে,বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘাত এতই তীব্রতায় বাড়ছে যে মনে হচ্ছে মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে, আল্লাহ্ যেন সবাইকে এর হাত থেকে রক্ষা করেন। এই যুদ্ধ এড়াতে দোয়ার পাশাপাশি আমাদের এমন ব্যবস্থাও নিতে হবে যার মাধ্যমে মানবতাকে এই আপাত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। এই বিষয়ে,আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সমস্ত এসোসিয়েশনকে বলতে চাই যে তারা দ্রুত সব ধরনের জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কার্যকরভাবে, এবং ব্যাপকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

(আল ফজল,২১ শে নভেম্বর, ২০২৪)

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) শুক্রবার ৩রা মে ২০২৪ তারিখে তাঁর খুতবাং বিশ্বযুদ্ধের অশুভ প্রভাব এড়ানোর জন্য অহংকার এড়ানোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

"যাইহোক,এই অবস্থাগুলি অহংকারীদের অহংকার ভাঙ্গার হাতিয়ারও তৈরী করেছে এবং এখন মনে হচ্ছে খোদা তা'লা তাদের অহংকার ভাঙ্গার জন্য হাতিয়ার তৈরীর প্রক্রিয়াও শুরু করেছেণ। এই কাজ কবে সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে খোদাই ভাল জানেন,কিন্তু যাইহোক, তাদের অহংকার এখন চুরমার হতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলিকে প্রজ্ঞা দান করুন, তারা যেন ন্যায়ের সাথে কাজ করে।"

সম্মানীয় শ্রোতা! বিশ্ব আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এর সবচেয়ে বড় কারণ বিশ্বের ন্যায় বিচারের অভাব।

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্বের বড় বড় ভবনে গিয়ে বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ না হবে,ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ! এই উপদেশ শুধু অন্যদের জন্য নয়, এই উপদেশের প্রধান লক্ষ্য জামাতের সদস্যরাও। জামাতের সদস্যদেরও সর্বস্তরে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। পার্থিব বিষয়ে এবং ধর্মীয় বিষয়ে উভয় ক্ষেত্রেই। ন্যায়ের দাবি পূরণ করুন,তবেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং এই ন্যায় বিচারই যখন আমাদের কথা ও কাজের মূলে থাকবে তখন এই যুদ্ধের কুফল থেকে আমরা রক্ষা পাব।

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্বযুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্রের সুপারিশ করেছেন। সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) অগ্রিম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্সিনোসিন এবং রেডিয়াম ব্রোমিয়াম হোমিও ওষুধ ব্যবহার করার কথা বলেছেণ। তিনি আরও বলেন, আপনারাও দোয়া করবেন যেন খোদা তা'লা প্রত্যেক বিশেষ ও সাধারণ মানুষকে তাঁর হেফাজতে রাখেন। আমীন।

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.), ২২ শে নভেম্বর, ২০২৪ এর প্রদত্ত খুতবা জুমআয় যুদ্ধ পরিস্থিতির তীব্রতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন-

"এখন আমি এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,যেমনটি সবাই জানেন, ইউরোপেও পরিস্থিতি খুব দ্রুত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ ও শান্তিপ্রিয় নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও রয়েছেন। যাইহোক, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের এবং শান্তিপ্রিয় মানুষজনকে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখেন; আর এরা যেন যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার না করে যার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি ও সুমতি দান করেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে প্রকৃত সত্য বোঝার সামর্থ্য দান করেন। দ্বিতীয়ত, এই বিষয়টির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, পরিস্থিতির যেরূপ দ্রুত অবনতি ঘটেছে এবং ঘটছে, সেই পরিস্থিতি

মহান আল্লাহ্র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

আগে থেকেই মনুষের এদিকে মনোযোগ নিবন্ধ রয়েছে,কিন্তু তার পরও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নিজেদের বাড়িতে দুই-তিন মাসের খাদ্যসামগ্রী মজুদ রাখুন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হোন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সচেষ্ট হোন,তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ও তা দৃঢ় করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন। আমীন।"

মহোদয়গণ, এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব আগুনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এর কু-প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,যাতে বিশ্বযুদ্ধের পর একটি জান্নাত-সদৃশ সমাজ গঠন করা যায় এবং যার দেখাশোনার দায়িত্ব থাকবে জামাতের উপর। হুযুর বলেন,

"আজকাল ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু আপনি যখন এখানকার পরিবেশে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব দেখেন এবং আমাদের উচ্চ নৈতিকতা দেখেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক দেখেন,এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের মনে সন্দেহ জাগে যে মুসলমানরা ভুল,অপরাধী ও অন্যায় শিক্ষা দেয়, সেই সব ধারণা দূর হবে। অতএব, এই দিনগুলোতে আপনার কথা এবং কাজ দ্বারা এই পরিবেশকে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করুন। সর্বদা এটি আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন যাতে বিশ্বে এমন একটি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় যে লোকেরা বলে যে তারাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই বিশ্বকে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারে। তাই এটাও নীরব তবলীগ যা আপনারা করবেন কোন সাহিত্য ছাড়া,কোন যুক্তি ছাড়াই। আমরা যদি আমাদের জীবনে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার মূল মডেল তৈরী করি,তাহলে আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার পূরণ করব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতি আমাদের বয়আত তখনই উপকৃত হবে যখন আমরা অন্তঃসারশূন্য স্লোগানের উপর নির্ভর না করে ইসলাম ধর্মকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরব।"

(খুতবা,জুমআ, ২৩ শে আগস্ট, ২০২৪)

অতএব, এই উদ্দেশ্যকে প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন,নিজের জন্য যা পছন্দ করো তা অপরের জন্যও পছন্দ করো। এই শিক্ষার আলোকে প্রত্যেক আহমদীর উপর দায়িত্ব বর্তায়, সে যেন এই প্রচার ও এই বার্তা- যা ইসলামের প্রেমপ্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা তা দুনিয়াকে জানায়, দুনিয়াকে এর সাথে পরিচিত করিয়ে দেয় আর এর বিস্তার ঘটায়। কেননা, এটিই মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র নিশ্চয়তা এবং এছাড়া আর কোন পথ নেই। অন্যথায় ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হতে থাকবে। এসব যুদ্ধের কারণে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী প্রজন্ম প্রতিবন্ধী, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।(১৮ই অক্টোবর, ২০২৪)

সুধী শ্রোতাগণ! সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "অত্যন্ত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে দোয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখে কারণ সে মহান আল্লাহ্র অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা দেখে এবং বিশ্বাস করে যে তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

(মালফুযাত,৭ম খণ্ড,পৃ: ২৬৫-২৬৬)

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) সর্বদা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশুভ প্রভাব এড়াতে জামাতের সদস্যদের দোয়া করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। হুযুর আনোয়ারের এমন কোন খুতবা বা বক্তৃতা নেই যেখানে তিনি দোয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। হুযুর আনোয়ার ৫ইএপ্রিল,২০২৪ এ প্রদত্ত খুতবায় বলেন-

"যুদ্ধের লেলিহান শিখা থেকে নিরাপদ থাকতে এবং এর পরবর্তী প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। এখন মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, বরং .... আহমদীদের নিজেদেরকে খোদার কাছাকাছি আসতে হবে এবং তাদের দোয়ায় কান্নাকাটি করতে হবে যাতে তারা এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। আমাদের দোয়া করা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা মানবতাকে রক্ষা করুন এবং আমাদের দোয়ায় আমাদের হক আদায় করার ক্ষমতা দান করুন। "

জলসা সালানা জার্মানী ২০২৪ উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশেষ দোয়ার তাহরীক করেছেণ। তার অনুসরণে একজন ব্যক্তি নিরাপদ দুর্গে অবস্থান করে নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারে। হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আমি এখানে একটি তাহরীকও করতে চাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ তৃতীয় স্বপ্নে দেখেন যে, একজন বুজুর্গ তাঁকে বলছেন, যদি জামাতের প্রত্যেক সদস্য, প্রত্যেক বুজুর্গ এই দরুদ শরীফটি দুইশত বার পাঠ করে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

এবং এরপর বলেন,যারা মধ্যবয়সী, পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী, তাদেরও অন্তত একশত বার পড়তে হবে। শিশুদের অন্তত ৩৩বার পড়তে হবে। যারা অল্প বয়স্ক, তাদের পিতামাতাকে এটি তিন,চারবার পাঠ করানো উচিত এবং একই সাথে ১০০ বার 'ইসতেগফার'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْۢبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

পাঠ করা উচিত।

এভাবে আমি আরও যোগ করেছি যে, ১০০ বার এটিও পাঠ করুন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ
وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

এই দিনগুলিতে বিশেষ করে এবং সাধারণত চিরতরে এটি করুন। স্বপ্নে তাকে দেখানো হয়েছিল যে আপনি যদি এটি করেন তবে আপনি নিরাপদ দুর্গে সুরক্ষিত থাকবেন যেখানে শয়তান কখনই প্রবেশ করতে পারবে না এবং সেই দুর্গে লোহার দেওয়াল রয়েছে যা স্বর্গে পৌঁছেছে। তাই শয়তান আক্রমণ করতে পারে এমন কোন ছিদ্র থাকবে না"

(মজলিস মুশাবিরাত, জামাত আহমদীয়া, ১৯৬৮-এর প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত)

এই দিনগুলিতে, শয়তান একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের উপর প্রতিটি কৌশল ব্যবহার করছে। এবং সাধারণভাবে বিশ্বকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, এটি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল বিশেষভাবে দোয়ার উপর জোর দেওয়া এবং শুধুমাত্র জলসার দিনগুলিতে নয় বরং সর্বদা এই দরুদ শরীফ ও যিকির,এগুলিকে আপনার জীবনের অংশ করে তুলুন এবং প্রত্যেককে, শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, পুরুষ প্রত্যেকরই এটিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

(খুতবা জুমআ, ২৩ শে আগস্ট, ২০২৪)

এছাড়াও হুযুর আনোয়ার অন্য একটি খুতবায় বলেন:

"পৃথিবীর অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা ও বৃহৎ শক্তি ন্যায় বিচার করতে চায় না। যুদ্ধ প্রসারিত হচ্ছে। আল্লাহ্ আহমদীদের এবং নিরপরাধদেরকে এর ভয়াবহ ও মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করুন। এর জন্য মহান আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এদিকে প্রত্যেক আহমদীর মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

(৪ঠা অক্টোবর, ২০২৪)

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে শেষ যুগের ইমাম শেষ যুগের ইমাম হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)কে অস্বীকার করা। তাই মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতি বয়আতের অঙ্গীকার করার জন্য মানুষকে আহ্বান করা দরকার। এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বিশ্বের মুসলমানদের সাধারণ অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। যাতে তারাও যুগ ইমামের আনুগত্য করে তাদের মর্যাদা পুনরায় ফিরে পায়। বিশ্বে যুদ্ধের যে সাধারণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে সেজন্যও দোয়া করুন। এখন যেদিকে যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বযুদ্ধ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, তবে আল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদী এবং প্রতিটি নিরপরাধ ব্যক্তিকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

(খুতবা জুমআ, ২৮ শে জুন, ২০২৪)

পরিশেষে আমি সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নির্দেশনার সাথে আমার নিবন্ধ শেষ করতে চাই। হুযুর আনোয়ার বলেন:

"পৃথিবী দ্রুত এক ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে ন্যায় বিচার নেই, অমুসলিমদের মধ্যেও ন্যায় বিচার নেই এবং শুধু ন্যায়বিচার নেই যে তা নয়, সকলেই নিষ্ঠুরতার চরম সীমা স্পর্শ করছে। তাই এমন সময়ে নৃশংসতা থেকে বিরত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশ্বের চোখ খুলে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে বাঁচানোর ভূমিকা পালন করতে পারে একমাত্র জামাত আহমদীয়া। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাস্তব প্রচেষ্টার পাশাপাশি দোয়ার প্রতিও অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। মুসলিম দেশগুলোর অন্যায় ও লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড যেখানে তাদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ভুগছে, সেখানে বাহ্যিক হুমকিও তাদের উপর খুব দ্রুত ঘোরাফেরা করছে। বরং তাদের দুয়ারে পৌঁছে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে একটি মহা যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, এবং বিশ্ব যদি এর পরিণতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয় তবে তারা উদাসীন। তাই এমন পরিস্থিতিতে মসীহ মোহাম্মদীর সেবকরা তাদের ভূমিকা পালন করে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দোয়া করার একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার হক আদায় করার এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।"

(২৬ শে এপ্রিল, ২০১৩-এর প্রদত্ত, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা প্রকাশিত, ১৭ই মে, ২০১৩)

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

রসুল করীম (সা.) এর প্রতি সাহাবাগণের প্রেমানুরাগ

আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণের নিকট প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যার উপমা হিসেবে বলা যায় তিনি (সা.) ছিলেন এক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ আর সাহাবাগণ তাঁর চারপার্শ্বে ভিড় জমিয়ে রাখত, যেন তারা পতঙ্গপাল। সাহাবাগণ তাঁর উপর নিজেদের মন ও প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দিতেন এবং তাঁর ছায়া-সঙ্গী হয়ে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আবার প্রিয় নবী (সা.)-এর খোদা প্রদত্ত প্রতাপ ও অত্যুজ্জ্বল চেহারার কারণে তাঁকে দু' চোখভরে দেখার ক্ষমতাও ছিল না, তাঁরা আঁ হযরত (সা.) কে প্রশ্ন করতে সংকোচ করতেন এবং অপেক্ষা করতেন, কোন এক গেঁয়ো বেদুঈন এসে জিজ্ঞাসা করুক যাতে তারাও শুনতে পান। তাঁদের নিকট আঁ হযরত (সা.) ছিলেন জগতের যে কোন বস্তুর থেকে মূল্যবান। তাঁরা যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর কাছ থেকে পৃথক হতে চাইতেন না, তাঁকে হারাতে চাইতেন না আর একথা প্রত্যেক মহিলা, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ ও শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবগণ প্রবল মর্মযাতনায় উন্মাদ প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। শোকের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে, হযরত উমর (রা.) এর ন্যায় বীরপুরুষও মুষড়ে পড়েছিলেন, তিনি চলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন আর তাঁর পা দু'টি শরীরের ভার নিতে পারছিল না। হুস্সান বিন সাবিত (রা.) এর এই পঙক্তিটিতে সাহাবাগণের অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ ☆ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

অর্থাৎ হে মহম্মদ! তুমি আমার নয়নের মণি ছিলে। তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যে মরে মরুক, আমি তো কেবল তোমারই মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম।' হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার মসজিদ মুবারকে পায়চারি করছিলেন এবং হুসসান বিন সাবিত (রা.) এর এই পঙক্তিটি পাঠ করে তাঁর প্রিয় প্রভু হযরত মহম্মদ (সা.)কে স্মরণ করে অঝোর নয়নে কেঁদে চলেছিলেন। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এই পঙক্তিটি যদি আমার মুখ নিয়ে নিঃসৃত হত! নিম্নে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি সাহাবাগণের প্রেমানুরাগের অক্ষয় উপাখ্যান থেকে কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হলঃ

৪ঠা হিজরী সনের সফর মাসে আজাল ও কারাহ গোত্রের কিছু মানুষ আঁ হযরত (সা.)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল- আমাদের গোত্রের অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। আপনি কয়েকজনকে আমাদের সঙ্গে রওনা করুন যারা আমাদেরকে মুসলমান বানাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে। আঁ হযরত (সা.) তাদের বাসনার কথা জানতে পেরে আনন্দিত হন এবং দশজন সাহাবার একটি দলকে তাদের সঙ্গে রওনা করে দেন। কিন্তু যেমনটি পরে আমরা জানতে পারব যে, এরা ছিল মিথ্যাবাদী আর বনু লাইহান এর প্ররোচনায় তারা মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন খালিদ এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল এই অজুহাতে মুসলমানরা মদীনার বাইরে পা রাখলেই তাদের উপর আক্রমণ করা হবে আর বনু লাইহান এই কাজের বিনিময়ে আজাল ও কারাহ গোত্রের মানুষদের জন্য অনেকগুলি উট পুরস্কার হিসেবে ধার্য করেছিল। আজাল ও কারা গোত্রের এই কুচক্রীরা যখন আসফান ও মক্কার মাঝামাঝি পৌঁছল, তখন তারা আবু লাইহানকে চুপিসারে এই সংবাদ পাঠালো যে, মুসলমানরা তাদের সঙ্গে আসছে, তারাও যেন চলে আসে। এই সংবাদ পেয়ে বনু লাইহান গোত্রের দু'শ যুবক- যাদের মধ্যে একশ জন তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করতে করতে রাজী নাম স্থানে তাদের ধরে ফেলে। সাহাবাগণ একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহন করে তাদের মোকাবেলা করেন। দশজনের মধ্যে সাতজন শহীদ হয়ে যান। আর খুবায়েব বিন আদ্দি, যায়েদ বিন উসনা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন তারিককে তারা মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে নীচে নামতে রাজি করায়। তারা বলে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু তাঁরা নেমে আসা মাত্রই তাদের বন্দী বানিয়ে নেয়। আব্দুল্লাহ্ যেতে অস্বীকার করলে আব্দল্লাহকে পথেই তারা হত্যা করে। বনু লাইহানের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়েছিল। এখন তারা কুরায়েশদের তুষ্ট করার জন্য এবং অর্থলোভে খুবায়েব এবং যায়েদকে সঙ্গে করে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। মক্কা পৌঁছনোর পর তারা তাদেরকে কুরায়েশদের হাতে বিক্রি করে দেয়। খুবায়েবকে হারিস বিন আমির বিন নওফিল এর ছেলেরা কিনে নেয়। কেননা, খুবায়েব বদরের যুদ্ধে হারিসকে হত্যা করেছিলেন। আর যায়েদকে কিনে নেয় সাফওয়ান বিন উমাইয়া।খুবায়েব এবং যায়েদ-এই দুইয়ের শাহাদতের ঘটনা অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তার বন্দী যায়েদ বিন উসনাকে সঙ্গে নিয়ে হারামের বাইরে যায়। কুরায়েশ নেতাদের দল সঙ্গে ছিল। বাইরে পৌঁছে সাফওয়ান তার ক্রীতদাস নাসতাসকে আদেশ দেয় যায়েদকে হত্যা করার। নাসতাস এগিয়ে এসে তরবারি হাতে নেয়। সেই সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব এগিয়ে আসে যায়েদকে বললেন-'সত্যি করে বল, তোমার কি ইচ্ছে করে না এই মুহূর্তে তোমার স্থানে আমাদের হাতে মহম্মদ থাকত যাকে আমরা হত্যা করতাম আর তুমি বেঁচে যেতে এবং তুমি স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে সুখে দিন যাপন করতে?" যায়েদের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ল। প্রচণ্ড ক্রোধের স্বরে তিনি বললেন, 'আবু সুফিয়ান এটা তুমি কি বলছ? খোদার কসম! আমি এটাও পছন্দ করি না যে আমার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে রসুলুল্লাহ্র পায়ে একটা কাঁটাও বিঁধুক।' আবু সুফিয়ান অবলীলায় বলে উঠলেন- 'আল্লাহ্র কসম আমি কোন ব্যক্তিকে কাউকে এমনভাবে ভালবাসতে দেখি নি যেভাবে মহম্মদের সঙ্গীরা মহম্মদকে (সা.) ভালবাসে।' এরপর নাসতাস যায়েদকে শহীদ করে দেয়।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫১৩-৫১৬)

ইসলামী সেনাবাহিনী মদিনার দিকে রওনা হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে রসুলে করীম (সা.)-এর শাহাদের গুজব এবং ইসলামী সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হওয়ার খবরাদি মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার মহিলা এবং ছেলে মেয়েরা পাগলের মত ছুটতে লাগল ওহোদের প্রান্তরের দিকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পথিমধ্যে সঠিক খবর পেয়ে থেমে গেল। বনী দিনার গোত্রের এক মহিলা উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে ওহোদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি উন্মাদীনির মত যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী, ভাই ও পিতা ওহোদে নিহত হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর এক ছেলেও নিহত হয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলো তখন তিনি বললেন, 'রসুল করীম (সা.)এর খবর কি? সংবাদাতা যেহেতু জানতেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত আছেন, সেহেতু তিনি ঘুরে ফিরে মহিলাকে তাঁর ভাই, তাঁর স্বামী ও ছেলের মৃত্যুর খবরই দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহিলাও ঘুরে ফিরে শুধু একই কথা বলছিলেন "مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" 'রসুলুল্লাহ্ (সা.)! এটা আপনি কি করলেন? ' বাহ্যিকভাবে কথাটিকে ভ্রমাত্মক মনে হয়। এবং এ জন্যই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, কথাটার অর্থ ছিল- 'রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি?' কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, কথাটা ভ্রমাত্মক ছিল না। স্ত্রী লোকদের ভাবাবেগ বেশি এবং তারা কোন কোন সময় মৃত ব্যক্তিকে ধরে নিয়েই তাকে সম্বোধন করে কথা বলে। যেমন, অনেক স্ত্রীলোক ছেলে মারা গেলে তার লাশকে সম্বোধন করে বলে , 'আমাকে ফেলে গেলে। এই বুড়ো বয়সে কেন আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে'। এটা শোকাভিভূত মনুষের প্রকৃতির একটা সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। তাই , রসুল করীম (সা.) এর মৃত্যুর খবর শুনে ঐ মহিলার অবস্থাও তদ্রুপ হয়েছিল। কিছুতেই তিনি তাঁকে (সা.) মৃত ভাবতে পারছিলেন না। এবং অপরদিকে সত্যতা ঠিক যাচাইও করতে পারছিলেন না। এ জন্যও শোকার্ত অর্থে ঐ কথাই বলছিলেন যে, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আপনি এটা কি করলেন? অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত ও দয়ালু ব্যক্তি আমাদেরকে এত বড় দুঃখ কি করে দিলেন?

লোকেরা যখন দেখলেন যে, মহিলার বাপ, ভাই এর কোন তোয়াক্কা নেই, তখন তাঁরা তাঁর প্রকৃত অনুভূতি বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে বললেন, 'অমুকের মা। তুমি যেমন চাচ্ছ, রসুল তেমনই আল্লাহ্র ফযলে ভালই আছেন। ' এতে মহিলা বললেন, 'দেখাও তিনি কোথায়?' লোকেরা বলল, 'সামনে এগিয়ে যাও, পাবে, তিনি ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন।' মহিলা এক দৌড়ে রসুল (সা.)এর কাছে পৌঁছে গেলেন। এবং তাঁর আচল ধরে বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি যখন ভাল আছেন, তখন আমি আর কারো জন্য চিন্তা করি না। '

এই তো সেই ঈমানের দৃষ্টান্ত যা পুরুষরা দেখিয়েছিলেন যুদ্ধে! নারীরা যুদ্ধের ময়দানে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার কিছু আমি তুলে ধরলাম।

খৃষ্টান জগত মরিয়ম মগদীলিনীর এবং তার সাথীদের সেই বাহাদুরীতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যে, তারা খুব ভোরে শত্রুদেরকে লুকিয়ে মসীহ (আ.) এর কবরের কাছে গিয়েছিলেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, এসো এবং আমার প্রিয়তমের (সা.) একনিষ্ঠ ও আত্মনিবেদিত অনুসারীদেরকে দেখ! কি অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং কি অবস্থায় তাঁরা তৌহিদের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন।

এই ধরণের আত্মোৎসর্গের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে ইতিহাসে। যখন রসুল করীম (সা.) শহীদগণের দাফনের কাজ সমাধা করে মদিনায় ফিরে আসছিলেন, তখন আবারাও নারীরা এবং ছেলেমেয়েরা শহরের বাইরে আসে তাঁকে স্বাগত জানাতে। রসুলে করীম (সা.) এর উটনীর লাগাম ধরে আসছিলেন মদীনার এক নেতা সায়াদ বিন মোয়ায। এবং তিনি দুনিয়ার সামনে এই কথা বলছেন, দেখ, আমরা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে ঠিকমত ঘরে নিয়ে এসেছি। শহরের কাছাকাছি এলে তাঁর বৃদ্ধা মা, যাঁর দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তিনিও এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। ওহোদে তাঁর

এক ছেলে উমর বিন মোয়ায শহীদ হয়েছিলেন, তাঁকে দেখে সা'দ বিন মোয়ায বললেরন,'ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার মা, ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমার মা আসছেন। ' তিনি (সা.) বললেন, 'অনেক বরকত ও আশিসের সঙ্গে আসছেন। বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন এবং রসুলুল্লাহ্ সা.) কে দেখার জন্য তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। শেষে রসুলুল্লাহ্ (সা.) চেহারার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল এবং তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'মা! তোমার ছেলে শহীদ হওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি আমার সববেদনা জানাচ্ছি।' এই কথা শুনে সেই পুণ্যবতী মহিলা বললেন, 'হযুর! আমি যখন আপনাকে ভাল অবস্থায় দেখেছি, তক্ষুনি আমি আমার সব দুঃখ বেদনাকে ভেজে খেয়ে ফেলেছি।' কি সুন্দর বাচন-ভঙ্গী! ভালবাসার কি গভীর অনুভূতি! চিন্তা ভাবনাই তো মানুসকে খেয়ে ফেলে, অথচ তিনি কত উদ্দীপনার সঙ্গে বলছেন যে, ছেলের চিন্তা আমাকে কি খেয়ে ফেলবে? যতক্ষণ মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) বেঁচে আছেন, ততক্ষণ আমি আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে গিলে খাব। আমার ছেলের মৃত্যুর দুঃখ তো আমাকে মারতে পারবে না। বরং সে যে রসুল করীম (সা.)-এর জন্য প্রাণ দিতে পেরেছে, সে আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে।' হে আনসার! আমার জীবন তোমাদের জন্য উৎসর্গিত হোক। কত না মহান পুরস্কার তোমরা পেয়ে গেছ। (নবীয়োঁ কা সরদার, পৃ: ১০১-১০২)

সমস্ত মুহাজির ও আনসার আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকত। যে যখনই সুযোগ পেয়েছে হাসিমুখে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। কুরআন করীম যার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে এই ভাষায়-مِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ । হযরত সাআদ বিন রাবি আনসারী (রা.) এর আত্মোৎসর্গের এর দৃষ্টান্ত দেখুন। মুহাজিরগণ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা এলেন এবং আঁ হযরত (সা.) প্রত্যেক মুহাজিরকে এক একজন আনসারের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করলেন, তখন আনসাররা তাদেরকে নিজেদের প্রকৃত ভাইদের থেকে বেশি ভালবেসেছেন এবং নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির অর্ধাংশ তাদের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য পিড়াপিড়ী করেছেন। কিন্তু একজন আনসার সাহাবী এমনও ছিলেন যিনি তাঁর মুহাজির ভাই আব্দুর রহমান বিন অউফকে বলেন, 'আমি আমার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি তার সঙ্গে নিকাহ করে নাও।' সেই সাহাবী ছিলেন সাআদ বিন রাবী আনসারী। যে ব্যক্তি নিজের পাতানো ভাইয়ের জন্য এমন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারে, তাঁর আবেগ কি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জন্য কোন অসাধারণ মানের হবে! হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.) বলেন- ওহোদের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ শেষে যখন শহীদদের দাফন এবং আহতদের উদ্ধারের কাজ চলছিল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন-

'আনসারদের সর্দার সাআদ বিন রাবীর কি অবস্থা, তিনি জীবিত না শহীদ তা কেউ গিয়ে খোঁজ নিক। কেননা, আমি যুদ্ধের সময় দেখেছিলাম বর্শাধারী শত্রু-সেনা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। তাঁর কথায় আবি বিন কাআব নামে এক আনসারী সাহাবী বের হয়ে যুদ্ধের ময়দানে ইতস্ততভাবে সাআদকে খুঁজতে থাকেন, কিন্তু তিনি কোন সন্ধান পান না। অবশেষে তিনি জোর গলায় সাআদের নাম ধরে তাঁকে ডাকতে শুরু করেন, কিন্তু তবু কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর মনে এই ভাবনার উদ্রেক হল যে আঁ হযরত (সা.)-এর নাম ধরে ডাকলে হয়তো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই ভেবে তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডেকে বললেন, 'সাআদ বিন রাবী কোথায়? আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। এই আওয়াজ পেয়ে সাআদ এর মৃতপ্রায় দেহে যেন বিদ্যুত তরঙ্গ খেলে গেল। তিনি চমকে উঠলেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন- 'কে বলছ আমি এখানে আছি।' আবি বিন কাআব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, কিছুটা দূরে নিহতদের স্তুপে সাআদ এর খোঁজ পেলেন, যখন কি না তাঁর প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা। আবি বিন কাআব তাঁকে বললেন, ' আঁ হযরত (সা.) আমাকে আপনার অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন।' সাআদ উত্তর দিলেন, 'রসুলুল্লাহকে আমার সালাম নিবেদন করবে আর বলবে- খোদার রসুলগণ তাঁদের অনুসারীদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে যে যে পুণ্য লাভ করে থাকেন, খোদা তা'লা আপনাকে সেই পুণ্য সকল নবীদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে দান করুন আর আপনার নয়নের স্নিগ্ধতা দান করুন। আর আমার মুসলমান ভাইয়েদের কাছেও আমার সালাম পৌঁছে দিও আর আমার জাতির কাছে এই সংবাদ দিও যে, যদি তাদের মধ্যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে কোন দুঃখ স্পর্শ করে তবে খোদার সমীপে তোমাদের কোন অজুহাত কাজে আসবে না। এতটুকু বলেই সাআদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০১)

বদরের যুদ্ধের সময় আঁ হযরত (সা.) যখন সাহাবাদের নিকট পরামর্শ চাইছিলেন, তখন এক আনসার সাহাবী বললেন: আমরা মুসার অনুসারীদের ন্যায় আপনাকে একথা বলব না যে, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ অর্থাৎ তুমি এবং তোমর প্রভু শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেড়াও। আমরা তো এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা আপনার ডানেও লড়ব বামেও লড়ব, আগেও লড়ব পিছনেও লড়ব। হে রসুলুল্লাহ্! শত্রুরা যতক্ষণ আমাদের মৃতদেহের উপর না যায় তারা আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না বা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হে রসুলুল্লাহ্! যুদ্ধ তো এক সাধারণ বিষয়। এখানে অনতিদূরেই রয়েছে সমুদ্র। আপনি আদেশ করুন! সমুদ্রে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। আমরা নিঃসংকোচে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এই ছিল সেই আত্মোৎসর্গ ও নিষ্ঠার নিদর্শন যার উদাহরণ অতীতের কোন নবী উপস্থাপন করতে পারে না। মুসার সঙ্গীদের উদ্ধৃতি তারা নিজেরাই দিয়েছে। ইঞ্জিল সাক্ষী রয়েছে যে র হযরত মসীহর শিষ্যরা শত্রুদের সামনে কোন্ দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। একজন তো সামান্য কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজের গুরুকে বিক্রি করে দিয়েছে। অপরজন তাঁর উপর অভিসম্পাত করেছে আর অবশিষ্ট দশ জন তাঁকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু মহম্মদ (সা.) এর সঙ্গীরা কেবল দেড় বছরের সাহচর্যেই ঈমানী শক্তিতে এমনই বলীয়ান হয়ে উঠেছে যে, তারা তাঁর আদেশে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত ছিল।"

(নবীয়োঁ কা সরদার, পৃ:)

আঁ হযরত (সা.) সাহাবাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদাচারী হওয়ার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবারা নিজেদের প্রিয় নবীর কথা কিভাবে মেনে চলতেন তার দৃষ্টান্ত দেখুন।

"সাহাবাদের প্রকৃতি এমন ছিল যারা নিজেদের প্রিয় প্রভুর প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ করার বিষয়ে উন্মাদনা রাখতেন। তাঁরা আঁ হযরত (সা.) এর এই উপদেশটি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অমিল। সেই কয়েদীদের মধ্য থেকে এক কয়েদীদের ছিল আবু আজীয বিন উমায়ের এর মৌখিক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) এর আদেশের কারণে আনসাররা আমাকে রুটি বানিয়ে খাওয়াতেন আর নিজেরা খেজুর বা এই ধরণের কিছু খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। আর অনেক সময় এমনও হত যে, তাদের কাছে রুটির ছোট টুকরো থাকলেও নিজেরা না খেয়ে আমাকে দিতেন। আর যদি আমিও লজ্জাবশত ফিরিয়ে দিতাম তবে তারা পিড়াপীড়ি করে আমাকেই দিয়ে দিতেন। "(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬৫)

" আঁ হযরত (সা.) বন্দীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিসয়ে এমন তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন যে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহাবারা নিজেদের পরনের জামা খুলে বন্দীদের, হ্যাঁ তাদের রক্ত পিপাসু বন্দীদের দিয়ে দিতেন। নিজেরা শুকনো খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়েছেন আর তাদেরকে রুটি সেঁকে খাইয়েছেন। নিজেরা পায়ে হেটেছেন আর তাদেরকে বাহনে বসিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মাঝে কোন যুগেও কি এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়?"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪১১)

ভালবাসার কিছু অনন্য গাথা শুনে নিন।

হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের আনসারী (রা.) এর বিষয়ে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। একদিন লোকেদের মাঝে বসে হাসিঠাট্টার কথা বলছিলেন, এমতাবস্থায় আঁ হযরত (সা.) তাঁর পার্শ্বদেশে (ভালবেসে) লাঠি দিয়ে খোঁচা মারেন। এতে সে বলল, হুযুর আমি তো এর প্রতিশোধ নিব। হুযুর (সা.) বললেন,বেশ চলে এস, প্রতিশোধ নাও।' তিনি বললেন, 'হুযুর আপনি তো কামিস পরে আছেন আর আমি আছি খালি গায়ে। একথা শুনে হুযুর শোধ দেওয়ার জন্য নিজের কামিস উপরে তুলে ধরেন। উসায়েদ বিন হুযায়ের হুযুর (সা.)-কে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর পবিত্র দেহে পরপর চুম্বন করতে থাকেন আর বলতে থাকেন, হুযুর! এটাই আমি চাইছিলাম। (আমি তো আশিস অন্বেষণের জন্য মনে মনে এই ফন্দি এঁটেছিলাম)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 29 May, 2025 Issue No.22

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ...

করেছিলে তখন তুমি তা নিক্ষেপ করো নি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন।' মোটকথা এর অভ্যন্তরে ঐশী শক্তিই কার্যকর ছিল, এটি কোন মানবীয় শক্তির কাজ ছিল না।

আর অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হলো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া-ও সেই ঐশী শক্তির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল, এর সঙ্গে কোনো দোয়া যুক্ত ছিল না বরং যা নবীজী (সা.) শুধুমাত্র নিজস্ব শক্তির মাধ্যমেই দেখিয়েছিলেন, যেখানে কোনো দোয়া ছিল না। অনেক সময় অল্প পানি যা একটি মাত্র বাটিতে ছিল, তাতে তিনি নিজের আঙুল প্রবেশ করালে তা এত বেশি হয়ে যেত যে, একটি সম্পূর্ণ সৈন্যদল, উট এবং ঘোড়াগুলোও তা থেকে পানি পান করত, তবুও পানির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। অনেকবার কয়েকটি রুটির ওপর হাত রাখলে তা হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষকে তৃপ্ত করত। আবার কখনো অল্প দুধে নিজের ঠোঁটের বরকত দান করে একটি দলের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতেন। কখনো লবনাক্ত কূপে নিজের মুখের লালা ফেলে তা মিষ্টি করে দিতেন। আবার কখনো কোনো মারাত্মক আহত ব্যক্তির গায়ে হাত রেখে তাকে সুস্থ করে তুলতেন। এমনকি কারো চোখের পুতলি যুদ্ধের আঘাতে ছিটকে পড়লে নিজের হাতের বরকতে তা আবার ঠিক করে দিয়েছেন। এভাবেই অনেক অলৌকিক কাজ তিনি নিজ শক্তি ও ঐশী সাহায্যে সম্পন্ন করেছেন, যেগুলোর পেছনে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি মিশ্রিত ছিল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

(সৌজন্যে: আলফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২রা মে, ২০২৫)

১১ পাতার পর..

(হাদীকাতুস সালেহীন, হাদীস নম্বর-৫২)

প্রসঙ্গত উসায়েদ বিন হুযায়ের অউস গোত্রের বনু আব্দুল আশহাল পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তিনি বরিষ্ঠ সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা বুআস এর যুদ্ধে অউস গোত্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উসায়েদ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, আনসারদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে অনবদ্য ছিলেন। সেই তিন জন হলেন, উসায়েদ বিন হুযায়ের, সাআদ বিন মুআজ এবং আব্বাদ বিন বিশর। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উসায়েদ একজন উঁচু মানের সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বাকার (রা.) উসায়েদকে অনেক সম্মান করতেন।"(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২২৯)

আল্লাহ তা'লা সাহাবাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, কেননা তাঁরা নিজেদের ঈমানের দাবি পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বয়আতের দাবি পুরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(মনসুর আহমদ মসরুর)

জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)

বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতে পর্দাহীনতা এবং ফোটেগ্রাফী

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

"বরের সামনে পাড়ার মেয়েরা পর্দা করা জরুরী মনে করে না, সে পর হলেও। তারা বলে, 'এর কাছে কিসের পর্দা?' আর তারা যে কেবল পর্দা করে না তাই নয়, এমনকি হাসি-তামাশাও করে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:

" যে কদর্যতা প্রচলন পেতে শুরু করেছে সেগুলির মধ্য একটি হল পর্দাহীনতার প্রবণতা, যা নিঃসন্দেহে শরীয়তের বিধিনিষেধকে উলঙ্ঘন করার কাছাকাছি পর্যায়ে পোঁছে গিয়েছে। আর এ বিষয়টি বিবাহপক্ষের অসাড়তাকে প্রকাশ করে দেয়। কেননা সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে অনেক লজ্জাশীলা মহিলা থাকেন। যথেচ্ছভাবে ছবি তোলা কিম্বা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও পরপুরুষকে ডেকে ছবি তোলা আর বিষয়টি পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকল কি না- সে সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাব- এনিয়ে স্পষ্টরূপে বারবার উপদেশ দেওয়া উচিত যে, আপনাদের যদি পরিবারের মধ্যে কোনও ভিডিও তৈরী করার পরিকল্পনা থাকে, তবে প্রথমে অতিথিদেরকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত এবং পরিবারের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই এই শখ পুরণ করা উচিত।

(দৈনিক আল ফযল রাবোয়া, পুস্তক- 'বদ রসুমাত ও বিদাআত অউর উনসে ইজতেনাব কে বারে মেঁ তালিমাত, পৃ: ৬০)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া,কাদিয়ান)

১ম পাতার পর..

যেতে পারে না। এমতাবস্থায় বাইবেলের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআন করীমের উপর আপত্তি করা যায় না, যার মধ্যে বর্ণিত ইহুদীদের ইতিহাস সম্পর্কে ঘটনাবলী বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। অথচ, ইহুদী ইতিহাসের বর্ণনাগুলি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন হারুন দ্বারা বাছুরের উপাসনা করা, মূসার ফেরাউনের মরদেহকে সংরক্ষন করা ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা যদি এবিষয়ে তওরাতের বর্ণনাকে সঠিক বলে ধরে নিই তবে কোন আপত্তি ওঠে না। কারণ কুরআন করীম 'কাবিরাহুম' ঘোষণা দিয়েছে, আকবারুহুম বলে নি। বারো জন পুত্র সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তানকেও কবীর বলা যেতে পারে। কেননা কবীর এর অর্থ কেবল বড় হওয়া, সব থেকে বড় হওয়া নয়। এছাড়া বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে এভাবেও সাজুয্য তৈরী করা যেতে পারে যে, কবীর-এর অর্থ বয়সে বড় নয় বরং মর্যাদায় বড় হিসেবে গ্রহণ করা হোক। 'কালা লান উরসেলাহু মাআকুম' আয়াতে প্রমাণ করেছি যে, হযরত ইয়াকুব ইহুদার উপর যতটা ভরসা করতেন, ততটা রোবানের উপর করতেন না। বিন ইয়ামিনকেও তিনি পাঠিয়েছিলেন ইহুদার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা লাভের পর। কাজেই এক্ষেত্রে ইহুদাই ছিলেন সব থেকে বড়।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir